প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৩০

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : অনুপ রায়
মুদ্রণ : রাজাপ্রিণ্টার্স

DIBYAHASINIR DINALIPI
A novel by Ashapurna Devi. Published
by Mitra & Ghosh Pub. Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Cal-73

ISBN : 81-7293-180-8

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডি. বি. প্রিন্টার্স, ৪ কৈলাস
মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬ হইতে আর. বি. মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত

স্নেহ ভালবাসার

শ্রীমতী মীরা সেন-কে

দিব্যহাসিনীর
দিনলিপি



হঠাৎ বড়লোক হবার ইচ্ছেটা মানুষের চিরকালীন। তার জন্য অনেক পথ পদ্ধতি। যখের ধন খোঁজা থেকে লটারির টিকিট। এবং ব্যবসা বাণিজ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত সুযোগ সন্ধানী লোকেদের কাছে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠার একটা পথ আবিষ্কার হয়েছিল, যখন তখন এখানে ওখানে বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার মতো—এক একটা নার্সারি স্কুল খোলা অথবা নার্সিংহোম খুলে বসা !··· তা সে অধিকারী অনধিকারী ভেদে।

এ যুগে অবশ্য অধিকারী অনধিকারী ভেদ শব্দটাই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ধান্দাবাজেরা সব কিছু ব্যাপারেই অধিকারী হতে পারে। পয়সার গন্ধ পেলেই অথবা পয়সার ছায়া দেখলেই সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল।

তো একেবারে এই লেটেস্ট যুগে আর একটা নতুন ধান্দা খুলে গেছে। যার নাম হচ্ছে প্রোমোটারি !

যদিও সেও দ্রুত পুরনো হয়ে আসছে। কারণ গুড়ের কলসির ধারে মাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকেই এসে যাচ্ছে তো সে লাইনে।

তবু আপাতত এর পরে তেমন লাভজনক ব্যবসা আর এসে আছড়ে পড়েনি। ওই ঢেউটাই খেলে বেড়াচ্ছে।···

তা ওরাও যেমন লোভের টোপটি ফেলেছে, তেমনি শহরের যত পুরনো এলাকার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বলিত বাড়ি ঘর দালানকোঠার বর্তমান বংশধরেরা, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেইসব তিন মহলা, চার মহলা চকমিলোনো প্যাটার্নের বিশাল বিশাল বাড়িঘর সমূহের মালিক হয়ে বসেছে, তারা সেই টোপটি গিলে ফেলে শরিকি ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ে সানন্দে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোন শরিক যদি বা একবার একটু গাঁইগুঁই করছে, টোপ-এর মাত্রা দেখে, আকর্ণ হেসে রাজি হয়ে যাচ্ছে।

কী দ্রুতই ভোল বদলে যাচ্ছে শহরটার।

তিনশো বছরের শহর···তিনশো বছরের শহর বলে গৌরব করে যে ধাষ্টামো করা হচ্ছিল, তাও ফুকে যাচ্ছে। যত সব পুরনো স্থাপত্য গড়া সৌধরা ধূলিসাৎ হচ্ছে, শহরের চেহারা আর তিন দশকেরও থাকছে না।···

শহরের আদি অংশ উত্তর দিকটা তো প্রায় সাফ হয়ে এসেছে, মধ্যটাও যেতে বসেছে। এবং ক্রমশ নেহাত-নাবালক দক্ষিণ অঞ্চলটাতেও বেশ হাত পড়েছে।

চোরাই গাছ কাটারা, যেমন বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষদের নির্মূল করে লোভের তাড়নায় তখনও সবুজ সতেজ যৌবন রসে সমৃদ্ধ গাছেদের গায়ে করাত চালায় তেমনি ঘটনা ঘটে চলেছে।

ইদানীং আবার কোনও কোনও বনেদি বাড়ির কুলাঙ্গার বংশধরেরা পুরনো ঐতিহ্য সম্বলিত সাজানো ফার্নিচার সমেত বাড়িখানাই ধরে দিচ্ছে প্রোমোটারের হাতে।

রয়ে বসে দেখেশুনে বেচতে পারলে হয়তো ওইসব ভিক্টোরিয়ান যুগের প্যাটার্নের মেহগিনি আবলুশ আর খাঁটি বর্মা টিক্-এ তৈরি আসবাবপত্র থেকে চতুর্গুণ দাম পেতে পারত!...কিন্তু সেই বেয়ে চেয়ে দেখার সময়টা কার কত?

হয়তো প্রবাসী বাঙালি, বা আমেরিকার অভিবাসী বাঙালি হয়তো বা ফালতু সম্পত্তিটা পেয়ে যাওয়া ভিন্ন গোত্র উত্তরাধিকারী, দু-দশদিনের ছুটির কড়ারে ছুটে এসে সব বেচে-টেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা যা পাচ্ছে তাই যথালাভ ভাবছে। তাও তো কম নয়, লাখ লাখ বাড়তে বাড়তে কোটিতেও পৌঁছোচ্ছে।

কেউ তো আর এই পূর্বপুরুষের ভিটেয় বাস করতে আসবে না। পড়ে পড়ে ধ্বংস হবে। অথবা সময় মতো ট্যাক্স খাজনা দিয়ে উঠতে না পারায় সেটা জমতে জমতে বকেয়ার দায়ে সম্পত্তি নিলামে উঠে বসবে। একই পরিণতি ট্যাক্সের হারও তো এখন আকাশে উঠছে।

তা হলে? তাহলে আর সেন্টিমেন্ট ধুয়ে জল খেয়ে লাভ?

তাতে শ্যামও গেল কুলও গেল।

তার থেকে এটাই বুদ্ধির কাজ। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।

তো শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে আপাত কিছুটা পুরনো একখানা বনেদি বাড়ি সম্প্রতি হাতে এসে গেছে প্রায় তরুণ প্রোমোটার কিশলয় চ্যাটার্জির। এঁরা মাঝারি গোছের বনেদি। তেমন ধনী নয়। খুব দামি দামি ফার্নিচার তেমন নেই। যাও ছিল, হয়তো সে সব আগেই পাচার হয়ে গেছে পূর্বতনদের বিলাসিতার খেসারতে।...যেমন গেছে রুপোর বাসনপত্র। মায় ঠাকুরদার রুপোর গড়গড়াটা পর্যন্ত।...কাঁসা পেতলও গেছে। ঢাউস ঢাউস সেইসব বাসন। কার কোন কাজে লাগবে? তাছাড়া ভাগের বাড়ি তো। বহু ভাগেই বিভক্ত হয়ে অখণ্ড একখানা সমারোহময় সংসারের ছাঁচ হারিয়ে ভগ্নাবশেষটুকু রেণু রেণু হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

কিশলয় চ্যাটার্জি যেটা পেয়েছে, সেটায় ছিল মাঝারি মাঝারি সব আসবাব। ঝপাঝপ বিক্রি হয়ে গেছে। হয়নি শুধু ঢাউস একটা দেরাজ সিন্দুক!

অর্থাৎ—সিন্দুকের মধ্যেই দুখানা টানা ড্রয়ার। বোধহয় অর্ডার দিয়ে নিজস্ব নক্সায় বানানো! কাঠটা সেগুন। কাজেই এযুগে দারুণ!

সেটাকে দেখাবার জন্যে কিশলয় একটা বাজার চলতি কাঠ মিস্ত্রিকে ডেকে এনেছিল। আসবাবখানা কাঠের দামেই বেচা যায় কি না বুঝতে। তা কাঠও তো যখন এ যুগে সোনার তুল্য। তাও আবার পুরনো দিনের সেগুন কাঠ! ভাল দাম পাবারই কথা।

তা ভাল দামই পাবার আশা হচ্ছে।…লোকটার যা আগ্রহ দেখছে।

দেখাবার সময় কিশলয় তার বৌকে আর মেয়েকে সঙ্গে এনেছিল। হেসে হেসে বলেছিল, দ্যাখোনা নজর করে দেরাজের মধ্যে ন্যাপথলিন কালোজিরের পুঁটলি সমেত কিছু শাল দোশালা, জরি বেনারসি পেয়ে যাও কিনা!

কাঠমিস্ত্রি জংধরা চাবিটা খোলার পর, দুটো দেরাজ হাঁটকে দেখে বৌ সুচেতা ঠোঁট উল্টে বলল, তা আর নয়!…তবু গুচ্ছের কাগজপত্র জাব্দা খাতার ডাঁই।

তবু আবারও সেইগুলোই হাঁটকানো হয় তিন জনে মিলে। যদি তার মধ্যে থেকে দুএক কেতা ব্যাংক নোট পেয়ে যাওয়া যায়। সেকালের বড়লোক। হয়তো রেখে দিয়ে ভুলে গেছে। নোটের গোছা না হোক, গিন্নিদের কারো রাখা একআধখানা লক্ষ্মীর কৌটোর গিনি মোহর?

তবে হেসে হেসেই আশাটা প্রকাশ করছে।

নাঃ। বৃথা আশা।

সুচেতা বলে উঠল, এমন সব পচা পচা কাগজপত্র। শিশি বোতলওলাও নেবে না!

কিন্তু সুচেতা কিশলয়ের মেয়ে ফুলকি একমনে সেইগুলোই হাঁটকে চলেছে।

কিশলয় বলে ওঠে, এই ফুলকি পুরনো ধুলোমাখা কাগজটাগজ অত ঘাঁটিস না আর। এখুনি অ্যালার্জির চোটে হাঁচতে শুরু করবি। তোর যা ধাত!

ফুলকি হঠাৎ উল্লসিত গলায় বলে ওঠে বাবা! একটা মজার জিনিস পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে! বোধহয় দারুণ।

সুচেতা বলে ওঠে ওর মধ্যে থেকে আবার তুই দারুণ কী দেখলি?… তোর তো সবই দারুণ। রাখ রাখ! চল; বাড়ি গিয়ে লাইফবয় দিয়ে হাত ধুবি!…যতসব পচা কাগজ।

তা তুমিই বা ওই পচা ড্রয়ারটা থেকে কী পাচ্ছ শুনি।

আরে দ্যাখ না। কী অপূর্ব অপূর্ব সব পুরনোকালের সেণ্টের শিশি। একেই বোধহয় বেলোয়ারি কাচ বলে, না গো? না কি কাটগ্লাস?

কিশলয় হেসে বলে, ওসব তুমিই ভাল জানো।…তো পাচ্ছ নাকি কিছু

বনেদি যুগের সুন্দরী গিন্নিদের ফরাসি সেন্ট ?

শুধু গিন্নিদের ? কর্তারা সেন্ট মাখতেন না ? যাঁদের বলা হত কলকাত্তাই বাবু। সুচেতা হেসে ফেলে বলে, বড়লোক কর্তারাই তো বেশি শৌখিন হতেন!

কিশলয় বলে, সেকালে কর্তারা নাকি এসেন্স টেসেন্স তেমন মাখতেন না। মাখতেন আতর! ··ওসব প্রেয়সীদের—সরি ইয়ে গিন্নিদের উপহার দিতেন।

যাই বলো বাপু, এক একটা শিশির এমন চমৎকার গড়ন। এটা দেখো—শিশিটার ছিপি খোলা যাচ্ছে না।

কাঠ মিস্ত্রিটা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল।

সুচেতা তাকে ডেকে বলল, এই শোনো। এটার মুখটা খুলে দিতে পারো?

কিশলয় নিচু গলায় বলে কী ছেলেমানুষ। খুলবে কেন ? আশা করছ, মুফতে এক শিশি দামি পারফিউম পেয়ে যাবে ?

মিস্ত্রিটা ছিপি খুলে দিয়েছে ততক্ষণে।

সুচেতা বলে, তা অবশ্য নয়। তবু দেখো। এখনও গন্ধ রয়েছে। কী আমেজি গন্ধ। কতকাল আগের কে জানে।

বারবার শুঁকতে থাকে সুচেতা।

ওই খালি শিশিগুলো নিয়ে যাবে নাকি ?

যাবই তো। এ তো রীতিমত ঘর সাজাবার জিনিস।

ঠিক আছে। চলো চলো এখন। ঢের বেলা হয়ে গেছে।···এই ফুলকি।—কী? তুইও ওই পোকা লাগা ঝুরঝুরে যাকে বলে পাঁপরভাজা হয়ে যাওয়া পচা খাতাফাতা কিছু নিয়ে যাচ্ছিস নাকি।

ফুলকি সতেজে বলে, যাচ্ছিই তো! দেখো না যা একখানা ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়ে গেছি বাপি।···

সুচেতা মুখ আর ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, সেকালের কোনও মহিলার কবিতার খাতাটাতা নাকিরে? যেমন ··ওহে দেব দয়াময় পতিতপাবন। তুমি বিনা দুঃখিনীর নাই কোনও জন—গোছের! যা চেহারা খাতার।

কিশলয় আবার তাড়া লাগায়।

চলো চলো বাড়ি গিয়ে হবে।···ওহে তুমি বাপু তাহলে কাল সকাল নটা দশটার সময় আসছ আবার।

আসব। আপনি স্যার আর কাউকে দিয়ে দেবেন না।

আহা! রাতারাতি আবার কাকে দিয়ে দিচ্ছি?···তবে—দামটা বাপু যা দিতে চাইছ তুমি, তাতে রামঠকা ঠকছি আমি!

মিস্ত্রিটা একটু মুচকি হেসে বলে, আসল ঠকাটা তো স্যার বাড়ির মালিকই ঠকেছেন। আপনার তো দুধেই হাত পড়ছে না।

এ যুগে কেউ ছেড়ে কথা কয় না! উঁচু নিচু ভাব-এর প্রশ্নই ওঠে না।



॥ ২ ॥

কলেজে এখন অশিক্ষক কর্মচারীদের স্ট্রাইক চলছে।···ফুলকির তাই কলেজ যাওয়া নেই। কাজেই সেই পাঁপরভাজা হয়ে যাওয়া খাতাখানাকে নিয়ে হুমড়ে পড়ে আছে কদিন।

এর মধ্যে একদিন বুঝি কবার হেঁচেছিল, সুচেতা বলেছে, হল তো? ওই পচা পুরনো কাগজ নিয়ে ঘাঁটো আরও! রোগ বাধিয়ে ছাড়বে দেখছি!

এত অ্যাবসার্ড কথা বলো তুমি! ওই জন্যে হাঁচি? বলছি না ভীষণ, ইণ্টারেস্টিং একটা জিনিস পেয়ে গেছি। তা তুমি তো একবার দেখতেই চাইছ না। আর বাপি? হি হি! বলল, ওই জাব্দা খাতাটা বুঝি বাবুদের বাজার সরকারের?···সংসার খরচের দৈনিক হিসেব লেখা!···সেকালে বড়লোকদের এমন সব খাতা থাকত। আধলা, না তখন তো পাই পয়সাও ছিল। তারও হিসেব থাকত!···হা হা হা— কর্তামার দোক্তা পাতা এক পয়সা এক পাই!

সুচেতা হেসে হেসে বলে, নিজেও তো এখন চাকরিটা ছেড়ে বিজনেসে নেমেছ। এখন ওই টাকা আনা পাইয়ের হিসেবই সার হচ্ছে!

ফুলকি বলে ওঠে, সে তো তোমার জন্যেই।

আমার জন্যে?

নয়তো কী? তোমারই তো কেবল সাধ বড়লোক হবার! বড়লোক না হলে নাকি এ জগতে কোনও মান থাকে না!

মিথ্যে বলেছি?

তা জানি না!···তবে কী এমন খারাপ ছিলাম আমরা? বাপি অফিস যেত, কখন ফিরবে বলে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতাম' বাপি এসেই কোলে তুলে নিত! তুমি বকতে ধাড়ি মেয়েকে আবার কোলে করা কী?

সুচেতা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বলে, তো এখনও সেইরকম অফিস যাওয়ার নিয়ম থাকলে, এসেই কোলে তুলত তোকে?

আহা সে কথা বলা হচ্ছে যেন! বলছি—বেশি বড়লোক হয়ে কী লাভ হয় বেশি!

সুচেতা অভ্যাসগত ঠোঁট ওল্টায়। বেশি! বেশি আবার পাচ্ছিস কোথায়? বড্ডই তো তোর বাপির বিষয় বুদ্ধি। নেহাত ছোটমামা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে দিয়ে সহকারি করে নিয়ে গড়া পেটা করছে। তাই।···আমিই কি বলেছি—অনেক বড়লোক হতে হবে তোমায়? একটু ভাল করে খেয়ে পরে, ভালোভাবে থাকতে পারবার মতো অবস্থা হলেই গুছিয়ে বসা হবে!

আমার খুব ভয় হয় মা।

ভয়?

সুচেতা ভুরু কোঁচকায়! ভয় কিসের?

এই বাবা যদি টাকা টাকা করে আর এখনকার মতো জলি হাসি খুশি না থাকে? যদি গম্ভীর হয়ে যায়? যদি সারাক্ষণ বাইরে বাইরে ঘোরে? যদি—

হঠাৎ কিশলয়ের গলা শোনা যায় পিছন থেকে!

আরে বাবা—যদির কথা কী হচ্ছে? যদির কথা নদীতে থাক। তো তোদের আর কদিন স্ট্রাইক চলবে?

কেন বাপি? আমাকে বুঝি তোমার চক্ষুশূল ঠেকছে?

এঃ! খুব কথা শিখেছিস যে?

ফুলকি হি হি করে বলে, আরও শিখব! অনেক নতুন নতুন শব্দ আর বাক্য বিন্যাস শিখছি।

কোথা থেকে? হঠাৎ কোন নতুন শিক্ষয়িত্রী জুটলেন?

বলব কেন?

বলেই ফুলকি বলে ওঠে, আচ্ছা বাবা! আমি যদি কোনও একটা জিনিস কুড়িয়ে পাই। তাহলে সেটা আমার নিজের জিনিস বলা যায়?

কিশলয় বলে, হঠাৎ এ প্রশ্ন ? কী পেয়েছিস কুড়িয়ে ?

হয় কিনা বলোই না আগে।

জিনিসটা কী ? তার মালিক কেউ আছে কিনা সেটার খোঁজ নিয়ে নেওয়া তো দরকার। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়—প্রকৃত মালিক প্রমাণ দাখিল করিয়া লইয়া যান।

আবার হা হা হাসি, তো কী কুড়িয়ে পেয়েছিস, কোনও মহিলার গলা থেকে খুলে পড়া সোনার হার ? না কি কানের দুল ? না রিস্ট ওয়াচ ?

ফুলকি রেগে বলে, এ মা ! বাপি ! ওইসব জিনিস হলে আমি একথা বলতাম ? আমি তেমনি হ্যাংলা ? এ অন্য জিনিস। তাছাড়া—

আর একটু হেসে বলে, এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হলে কোন কাগজে দেওয়া হবে যা মালিকের কাছে পৌঁছবে সেটা ভেবে দেখতে হবে।

আরে বাবা। তুই যে ক্রমেই রহস্যময়ী হয়ে উঠছিস। জিনিসটা কী তাই দেখি।

দেখবে। আচ্ছা আনছি।

বলে ফুলকি ছুটে গিয়ে তার সেই দারুণ আবিষ্কার পচা ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া লাল খেরো বাঁধানো জাবদা খাতাখানা নিয়ে আসে। সাবধানে বাঁধনটা খোলে।

আরে ! এইটা ? ব্যাপারটা কী ? এর মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ার ইশারা আছে নাকি ?

আহা তোমাদের এখন যা হয়েছে। কেবল ধন দৌলতের চিন্তা। এর দামই আলাদা !

বলে মুদির দোকানের হিসেবের খাতার মতো সেই খেরোয় বাঁধানোর খাতাটা খুলে তার প্রথম পৃষ্ঠাটা বাপের সামনে খুলে ধরে ফুলকি !

কিশলয় বলে ওঠে আরে ! হাতের লেখাটা তো খুব পরিষ্কার ! বলেই সেই পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা পাতাটার ওপর চোখ ফেলে। চোখ বুলিয়েই চলে।

সবটা পড়েছিস নাকি ?

না পড়ে দামি জিনিস বলছি ? এ থেকে সেকালের রীতি নীতি সমাজের ব্যবস্থা অনেক কিছু জানতে পারবে তুমি বাবা !

আমি ? আমার জেনে কী হবে ? একটা হেডিংও রয়েছে দেখছি—রাখ। পরে দেখব !

তুমি আর দেখেছ ! মারই সময় হল না, তা তোমার ! বলে খাতাটা নিয়ে চলে যায় ফুলকি !

ফুলকি যেটাকে জিনিস বলে মনে করছে, সেটার দিকে যদি এদের তাকিয়ে দেখতেও সময় না হয়। অভিমান হবে না তার ?



॥ ৩ ॥

কিন্তু কী ছিল ওই খাতাটায় ?

ফুলকি যেটা সবটা পড়ে ফেলতে পেরেছে ? অবশ্য হাতের লেখাটি সহজ পাঠ্য না হলে কী হত বলা যায় না। বিষয় বস্তুটি কী ?

শিরোনামটি তো এই—

শ্রীমতী দিব্যহাসিনী দেবীর দিনলিপি।

অদ্য বঙ্গাব্দ বারোশো অষ্ট নব্বই তাং ষোলোই আশ্বিন শুক্রবার—আমি শ্রীমতী দিব্যহাসিনী দেবী এই দিনলিপিটি লিখিতে শুরু করিলাম।

কিন্তু কেন করিলাম ?

আমি কে ? কী এমন মানুষ ? যে আমার দিনলিপি ? এর আবার মূল্য কী ? হয়তো কিছুই নাই। তবে এ লেখা তো অপর কাহারও চক্ষুগোচর হইবার জন্য নয়। সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। শুধু লিখিবার ইচ্ছায় লেখা।…মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে নিত্যদিন কত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, জীবনের কত পট পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে, এর কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়।…যদিও সকল ঘটনাই স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা আছে। সকল ছবিই মনের দেওয়ালে অঙ্কিত আছে। তথাপি, ভবিষ্যতে

হয়তো ভুলিয়া যাইতেও পারি। অথবা তাও নয়। এ শুধু কিছু একটু লিখিবার ইচ্ছার ব্যাকুলতা।

আমি একটি অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ। ঠাশবুনুনি, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের বহুবিধ দায় দায়িত্ব সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে অবকাশ মেলে। দাস দাসীর সংখ্যা অনেক। তখন ইচ্ছা হয়, সংসারের কাজ ছাড়াও অন্য কিছু করি! তাই এই দিনলিপি লেখার সাধ!

এ সংসারে মেয়ে বৌদের কারও কারও বই পড়িবার শখ আছে, কিন্তু সেই পড়াটি গিন্নিদের চোখের সামনে কদাচই নয়। বৌ ঝি নাটক নভেল পড়িয়া সময় নষ্ট করিবে; এ তাহাদের কাছে বিরক্তিকর॥ তাছাড়া—সেটি যেন তাঁহাদের মর্যাদাহানিকরও! গুরুজনের সামনে বিদ্যা ফলানো অনুচিত! ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

আমি তো বই পড়িতে না পাইলে, খুবই কাতর হই! তবে আমার হৃদয়বান স্নেহশীল স্বামীর কৃপায় অনেক বই পাই। তো সে সব পড়িতে হয় সকলের অলক্ষ্যে। রাত্রে! ইহাতে আবার স্বামী হাসিয়া হাসিয়া বলেন, আমি তো আচ্ছা বোকামি করেছি! নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চেষ্টা যত্ন করে সতীন এনে ঘরে পুরেছি। বলেন, তবে রাগ করেন না, হেসে হেসে।...তাঁর নিজেরও তো তাস ও দাবা খেলিবার নেশা আছে। বাড়িতে যেসব তুতো-ভাই বা ভগিনীপতি আছেন, সদরে বৈঠকখানা ঘরে তাঁহাদের একটি তাসের আড্ডা বসে। স্বামী সেখানে গিয়া ভিড়িয়া যান।...আবার তাঁহার যে কাকাটির দাবা খেলার ঝোঁক আছে, তাঁহার ডাকাডাকিতে সেখানে গিয়াও বসিতে হয়। কাজেই, রাতে শুইতে আসিতে দেরি হয়। সেই সময়টুকুই আমার কাছে পরম মূল্যবান। আনন্দেরও।

এ বাড়ির সব পুরুষদেরই প্রায় একই ধারা। কেহই অধিক রাত্রি ব্যতীত অন্দরে আসেন না। গভীর রাত ভিন্ন শয়ন ঘরে পদার্পণ করেন না। কাজেই বৌদের সকলেরই একই অবস্থা। তবে অনেকেই ওই সময়টা দিব্য একখানি লম্বা ঘুম ঘুমাইয়া লয়। এবং স্বামী ফিরিলে রাগারাগি করিতেও ছাড়ে না। তবে আবার এক একজন, এক একরকম। আমার একজন জ্ঞাতি বড়জায়ের লেস বুনিবার খুব শখ আছে। শখ কেন প্রায় নেশাই। তাঁহার ওই সময়টি যায় লেস বোনায়। কাজেই তিনি স্বামীর খেলার নেশায় অখুশি নন। তাছাড়া অনেকের তো কচি কাচাও আছে। তারা একটু ঘুমাইতে পাইলে বাঁচে!

আমার সে স্বাদ জানা নাই। তবে বন্ধ্যা বলিয়া কেহই আমাকে অবজ্ঞা করে না। বরং আমার অবকাশের সময় বেশি থাকায় অন্য জায়েদের বা বড় বড় ভাসুরপো বৌদের ছেলেমেয়েকে দেখাশুনো করিতে পারি। ও নাওয়া খাওয়ার তদারকি করিতে পারি এতে সকলেই প্রীত!

আমারও তো সন্তানহীনতার জন্য কোনও শূন্যতা বোধ নাই। বাড়ির সব ছেলে মেয়েরাই আমায় ভালবাসে! অনেকেই তাহাদের যা কিছু ছোটখাটো প্রয়োজনে আমারই শরণ নেয়। যেমন জামা প্যাণ্টের বোতাম খসিয়া গেলে লাগাইয়া দেওয়া, স্কুলের বইখাতাপত্র গুছাইয়া রাখা, ছোট্ট মেয়েদের চুলে সুন্দর করিয়া রিবন বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি। একটু বড়দের দু-বিনুনি ঝুলাইয়া চুল বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি।...আমার স্বামীকেও সন্তান হীনতার জন্য দুঃখ বোধ করিতে দেখি না। আসলে বাড়িতে এত ছেলেমেয়ে যে, শূন্যতা বোধ আসে ন

এ সংসারের একটি নিয়ম—বৌদের কেবল কোলের ছেলে মেয়েটি বাদে, বাকিরা একটু বড় হওয়া মাত্রই বাপ মার ঘর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ঠাকুমা পিসি বা বিধবা জ্যেঠি খুড়ির ঘরে আশ্রয় পায়। পুরাতন দাসীরাও থাকে সে ঘরে!

ইহাই এ বাড়ির রীতি।

কাজেই কোনও ছেলেমেয়েই আলাদা করিয়া মাতৃনির্ভর হয় না। এবং বিশাল একটি তুতো-ভাইবোন বাহিনী। হয়তো তার সঙ্গে তুতো-কাকা পিসিও দুএকটির মিশেল থাকে তাহাদের নিজস্ব একটি জগৎ থাকে। আর তাহাদের মধ্যে কে নিতান্ত নিকট সম্পর্ক। কে দূর সম্পর্ক, কে তিন সিঁড়ির জ্ঞাতি তা খেয়াল থাকে না কারো। জানে সকলেই একবাড়ির।

অর্থাৎ কি না মনোহরপুকুরের এই মুখুজ্যে বাড়ির।

শুনিতে পাই আমার দাদা শ্বশুর স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমান জেলার কোন গ্রাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া এখানে বসত স্থাপন করিতে বেশ কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন এই অঞ্চলে দিনে শিয়াল ডাকিত। জমির অধিকাংশই জঙ্গলে ঢাকা ছিল।... জলের দামে জমি পাইয়াছিলেন।

তা সে অনেক গল্প। এ সংসারে বৌ হইয়া আসা পর্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি! না কি মনোহর নামক কোনও ডাকাত এই পুকুরটি কাটাইয়াছিল, তাই পুকুরটির নাম ছিল ডাকাতে পুকুর। পরে মনোহর ধার্মিক হইয়া যাওয়ায় তাহার নামেই নামকরণ হয়।...আবার সম্পূর্ণ উল্টা অন্য গল্পও শুনিয়াছি।...সবই কিম্বদন্তি।...দুচার বছর পার হইলেই কাহিনীর বদল ঘটে। মুখে মুখে বলবার ভঙ্গির পার্থক্যে।

সে সব গল্প থাক! আমার জানা জগতের প্রত্যক্ষ দেখা জগতের প্রতিদিন

রাত্রির পরিচয়ে নিজস্ব হইয়া ওঠা জগতের কথাই লিখি।

লিখিব বলিয়া আমার এক জ্ঞাতি দেবরের বালক পুত্রকে কিছু পয়সা দিয়া একখানি রুলটানা কাগজের ভাল বাঁধানো খাতা আনিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। কারণ সে এখন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। খাতার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।…কিন্তু সে ছেলেমানুষ একা দোকানে যাওয়ার সাহস না করিয়া নাকি সরকার মশাই নিকুঞ্জকে বলিয়াছিল। আর তিনি অল্প পয়সায় অনেক পাওয়া যাইবে হিসাব কষিয়া দিস্তা হিসাবে এই বালির কাগজ কিনিয়া আনিয়া দপ্তরিকে দিয়া বাঁধাইয়া খাতা বানাইয়া দিয়াছেন।

খাতার চেহারা দেখিয়া আমি হাসিব না কাঁদিব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কী আর করিব, বেশি বলাবলি করিতে গেলেই তো লোক জানাজানি হইয়া যাইবে। ও বাবা!

অপছন্দের বস্তু মানিয়া লওয়াই তো জীবন। নিজের চেহারা খানাই তো নিজের পছন্দের হওয়ার উপায় হয় না মানুষের।…আমার তো তবু বলিতে হইবে সেক্ষেত্রে বিধাতার অশেষ দয়া। যদি আমার বাপের বাড়ির গ্রামের ছোট ঠানদির মতো হইত? ইস! ওরে বাবা! অনেক সময় আমি এই উদাহরণ মনে আনিয়া মনকে প্রবোধ দিই!

যখন আমার দেবর পুত্রটি খাতাখানি হাতে দিয়া উৎসাহ সহকারে বলিল, দেখো নতুন জ্যেঠি কী ইয়া মোট্‌কা হয়েছে। পছন্দ হয়েছে তো? আবার তোমার কিছু পয়সাও বেঁচেছে বলিয়া একটি দোয়ানি, একটি আনি ও একটি ডবল পয়সা ফেরত দিতে আসিল, আমি হাসিয়া বলিলাম, খুব পছন্দ হয়েছে। ওই পয়সাটা আর ফেরত দিতে হবে না। তুমি নাও! ল্যাবনচুষ কিনে খাও গে।

সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, বাঃ আমি নেব কেন? না না।

আমি জোর করিয়া গছাইয়া দিলাম।

পরে অবশ্য খুবই আহ্লাদের সঙ্গে বলিল, বাবাঃ। এত পয়সার ল্যাবনচুষ! …কত হবে। সব্বাই মিলে খাওয়া যাবে।

প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

এই প্রাপ্তিটিই কি কম? যদি আমি খাতা দেখিয়া মনমরা ভাব দেখাইতাম, এই প্রাপ্তিটি কি ঘটিত?



॥ ৪ ॥

নামকরণ তো একটা করিয়া বসলাম দিনলিপি কিন্তু কী ভাবে শুরু করিব? কোন দিনটিকে প্রাধান্য দিব? না হঠাৎ আজ থেকেই? এই ষোলোই আশ্বিন থেকেই শুরু করিব?

কিন্তু ঠিক আজ তো তেমন কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটেইনি! একটা সাদা-মাঠা দিন। এবারে পুজো আশ্বিনের একেবারে শেষে, তাই পুজোর বাজনাও শুরু হয় নাই এখনও।

তবে?

আচ্ছা, যদি লিখিতেই হয়, তাহা হইলে সেই দিনগুলির কিছু কিছু বিশেষ কথাই কি লিখিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয় না, যে দিনগুলি প্রায় হারাইয়া গিয়াছে। প্রায় লিখিতেছি এই জন্য, সত্যিই কি হারাইয়া গিয়াছে? মনের অন্তরকোঠায় তো সবই জমানো আছে। তবে সুনির্বন্ধ নয়। কিছুটা এলোমেলো ভাবে! সেইভাবে লিখিতে চেষ্টা করা যাক। যেমন বয়সের কাল অনুসারে। যথা—

শৈশবকাল।

অস্ফুট স্মৃতিতে আবছা যে ছবিটি ধরা দেয়, সেটি হইতেছে আমার বড় দাদার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রশান দিবস।

আমি আমার পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাই আমার বয়সের সাহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বয়সের মাত্র তিন বৎসর তফাত! কাজেই ধরিয়া লইতে হয় এ স্মৃতি আমার সাড়ে তিন বয়েসের।

আমার পিতৃগৃহ শহরে নয়, চব্বিশ পরগনার রাংচিতা নামক একটি গ্রামে। তবে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। আমার পিতামহ স্বর্গীয় ভারত জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের মধ্যে পণ্ডিত হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্য কিছু জ্যোতিষ চর্চাও করিতেন। সেই বাবদই বোধহয় নানা লোক তাঁহার কাছে আসিত। অথবা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে। জানা নাই কী জন্য। তবে অতি শৈশব হইতেই বাড়িতে বহুলোকের আনাগোনা দেখিয়াছি। এবং পঠন-পাঠনও দেখিয়াছি। পিতামহের আমি বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলাম। সর্বদাই তাঁহার সহিত ঘুরিতে পাওয়ার সুযোগ পাইতাম। এমনকি বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত বহির্বাটিতে তাঁহার কাছে বসিবার অধিকার পাইতাম।

পিতামহ তাঁহার ওই প্রথম প্রপ্রৌত্রের অন্নপ্রাশনে নাকি সাধ্যের অতিরিক্ত সমারোহ করিয়াছিলেন। কিছুটা বড় হইবার পরও পাড়ার লোকজনের মুখে তাহার আলোচনা শুনিয়াছি।

পিতামহ তাঁহার প্রথম প্রপৌত্র আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজীবন। শুনিতে পাই পিতামহের পিতার নাম ছিল রামজীবন। আমার পাঁচ ভ্রাতার নামও ওই জীবন দিয়া। যোগজীবন, সত্যজীবন, নিত্যজীবন, পুণ্যজীবন, শুভ্রজীবন।···

কিন্তু হায়! এত জীবন যুক্ত করা সত্ত্বেও, প্রায় সকলেই ছিলেন অল্পজীবী! পিতৃবংশে এখন ওই ভ্রাতুষ্পুত্ররাই আছে। অথচ আমার দুই দিদি মঞ্জুভাষিণী, সুধাহাসিনী এবং এই আমি দিব্যহাসিনী দিব্য টিকিয়া আছি। এমন কি আমাদের পিসিমা মধুহাসিনী দেবীও!

পিসিমার মতে আমরা মেয়েরা ভিন্নগোত্র হইয়া গিয়াই নাকি আয়ু পাইয়াছি। বংশ গোত্রের উত্তরাধিকারীরাই স্বল্পায়ু! পিসিমার এও মত মহৎ বংশ নাকি বংশে দীর্ঘ ধারা রাখিয়া যায় না।

আমি এই সব কথার অর্থ বুঝি না! কেন তেমন হইবে? তা জীবনে কটা অবোধ্য প্রশ্নেরই বা সদুত্তর মেলে?

কিন্তু যাহা লিখিতে ছিলাম, বিশ্বজীবনের অন্নপ্রাশনের সমারোহই আমার

জীবনের প্রথম উজ্জ্বল স্মৃতি।···কত যে লোক খাইয়াছিল তাহার হিসাব নিকাশ জানা নাই। আমি আমার শিশু দৃষ্টি লইয়া বিস্ময়ে দেখিয়া চলিয়াছিলাম মাত্র।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাজানোও যে হইয়াছিল কত! সর্বাঙ্গে সোনার গহনা! সুন্দর কাপড় চন্দন।

যখন সাজানো হইতেছিল তখন অবশ্য সে প্রবল আপত্তিতে কান্না জুড়িয়াছিল। কী মাস তা জানা নাই, বোধহয় গ্রীষ্মকাল ছিল। খোকা খুব ঘামিতেছিল। যখন নিয়ম মাফিক তাহার সামনে একটি রুপোর রেকাবে—দোয়াত কলম, একটি টাকা একটু মাটি ও একটি বই রাখা হইয়াছিল এবং কোনটি সে আগে হাতে তুলিয়া লইবে তাহা দেখিতে কৌতূহলী সমবেতরা উদগ্রীব তখন আমারও এই অনুষ্ঠানের মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলেও খুব কৌতূহল জাগিতেছিল। আর যখন সে প্রথমেই কলমটি হাতে ধরিল তখন সকলে মিলিয়া হাততালি দেওয়ায় বুঝিলাম সে একটি ভাল কাজ করিয়াছে।

মানে না বুঝিয়াও আমার খুব আনন্দ হইয়াছিল।···

কিন্তু একটি বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিল অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভাইপোর রেশমের গোছার মতো সুন্দর থোকা থোকা চুলগুলি মুড়াইয়া দিয়া ন্যাড়া করিয়া দেওয়ায়।··

আহা কী সুন্দরই দেখিতে ছিল! ওই চুলগুলির জন্য।

ন্যাড়া করার ফলে মুখটাই যেন কেমন বোকা বোকা হইয়া গেল। হাসির সেই জৌলুস রহিল না।

আমি রাগিয়া ঠাকুমাকে কহিলাম, তোমরা খোকনসোনাকে ন্যাড়া মুণ্ডু করে দিলে কেন?

ঠাকুমা হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাবা এই নিয়ম!

আমি ঠাকুমার উপর আরও রাগিয়া বলিলাম, বাজে কথা! কই, মণ্টিপিসিদের বাড়ির সেই ছেলেটার যে ওই অন্যোপশন না কী হল। আমরা নেমনতন্নো গেলাম, তাকে তো ন্যাড়া মুণ্ডু দেখলাম না।

ঠাকুমা আরও হাসিয়া বলিলেন, ওদের অন্য নিয়ম। ওদের আঠারো মাসে—আমাদের এই নিয়ম।

আমি উত্তরে হাত পা ছুঁড়িয়া বলিয়াছিলাম, তোমাদের ছাই নিয়ম। পচা নিয়ম! তোমাদের কিছু মায়া দয়া নেই। অমন সুন্দর চুলগুলো নাপিতভায়া কচ কচ করে কেটে ফেলে দিল। তোমাদের মনে দুঃখু হল না?

ঠাকুমার আর হাসি থামে না। আমার মাকে ডাক দিয়ে বললেন ও বড় বৌমা। শোনো এসে তোমার দয়ামায়াবতী ছোট কন্যে কী বলছে। বলে খোকনকে ন্যাড়া করে দিলে কেন? তোমাদের মায়া দয়া নেই।

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলেন, ওর কথা বাদ দাও মা!

সেকালে শাশুড়ি নানদকে যতই ভয় ভক্তি করুক বৌরা, আপনি আজ্ঞে করার রেওয়াজ ছিল না। তবে গলা তুলিয়া কথা বলা চলিত না। আমার মা বড়বৌ ছিলেন বলিয়া সহজভাবে কথা বলিতে সাহস করিতেন।…আমার খুড়িরা ঠাকুমার কাছে কোনও আর্জি জানাইতে হইলে, মাকে আগাইয়া দিতেন।

মা বলিলেন, ওর কথা বাদ দাও!

আমার ভাগ্য! আমি যেমন পিতৃগৃহে পিতার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান তেমনি পতিগৃহেও সর্ব কনিষ্ঠ। কাজেই চিরদিন রাঙা বৌই রহিয়া যাইলাম। আমার কথার কেহ কোনও গুরুত্ব দেয় না। বলে ওর কথা ছাড়ো। তা বলুক না, সকলেই ভালবাসে। ইহার থেকে পাওয়া আর কী আছে?

রাগ ঝাল দাপট, সর্বদা রক্ত চক্ষু ইত্যাদির দ্বারা হয়তো ভয় ভক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাই কি একমাত্র কাম্য? অনেকের এই রূপই দেখি! কী জানি সর্বদা অন্যের ভীতিকর হইয়া থাকায় লাভ কী? সুখ কোথায়?

আমাদের রাংচিতার বাড়িতে ছেলেবেলায় ছিলেন আমাদের একজন অমনি ভীতিকর। ঠাকুমা তাঁহাকে ঠাকুরঝি বলিতেন। আমরা বলিতাম পিসঠাকুমা! বাড়ির সকলে তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিত। তিনি নাকি ঠাকুরদার ছোটবোন। তা যে ঠাকুরদাকে পাড়া প্রতিবেশীরাও ভয় সমীহ করিত, সেই ঠাকুরদাও তার সেই ছোটবোনকে গুরুজনের মতো ভয় সমীহ করিতেন। কেবলমাত্র ওই মেজাজের জন্য।

শুনিতে পাই তিনি নাকি মাত্র আট বছর বয়েসে বিবাহ ও সাড়ে নয় বছরে বিধবা! চিরদিনই পিতৃগৃহে। এবং সে গৃহের তিনিই ছিলেন দণ্ড মুণ্ডের কর্তা।

আবার সকলেরই তিনি হিতকারিণীও ছিলেন।

পাড়ায় কাহারও অসুখ বিসুখ করিলে তিনিই ছুটিতেন তাহাদের সেবা-যত্ন দেখাশুনো করিতে। বাড়ির তো বটেই পাড়ার কাহারও শক্ত অসুখ করিলেও পিসঠাকুমাই ছুটিতেন দেবমন্দিরে মানত করিতে, কলিকাতার কালীঘাটে গিয়া ধর্না দিতে তারকেশ্বরে গিয়া হত্যা না কি দিতে।

আবার অন্য কাহারও বাড়িতে কেহ মারা গেলে, সেই বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, বড়দের অশৌচপালনের বিধি ব্যবস্থা বুঝাইয়া তো দিতেনই, আবার তাহার জন্য যা সব প্রয়োজন, বাড়ি হইতে পাঠাইয়াও দিতেন। যেমন ফল, গাওয়া ঘি, কাঁচা দুধ, আরও কী সব যেন!

আবার—পরের বাড়ির লোকেরাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করিলে তিনি অযাচিতভাবে সেখানে গিয়া পড়িয়া, সালিশ করিতেন, দোষিকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতেন। এমনকি যাচ্ছেতাই করিতেও ছাড়িতেন না।···আশ্চর্য! কেহ অগ্রাহ্য করিত না।

ভারি বিচিত্র চরিত্র ছিল আমাদের সেই পিস ঠাকুমার। তাঁহার কথা বলিতে গেলে কথা ফুরাইবে না।

কাহার কথা বলিতে গেলেই বা ফুরাইবে?

আমার পিতামহের কথা বলিতে গেলে?

আমার বাবার কথা বলিতে গেলে?

বাল্য শৈশবের স্মৃতি, একবার মনে আনিলেই উথলাইয়া ওঠে! কতটুকুই বা লিখিয়া উঠিতে পারিব?

বরং শুধু বিশেষ ঘটনাগুলির কথাই লিখি।





॥ ৫ ॥

খোকন সোনা বা বিশুর অন্নপ্রাশনের কিছু পর আর একটি উৎসব আমার বাল্যচিত্তে বিশেষ দাগ কাটিয়াছিল।

তাহা হইতেছে আমার মেজ দিদি সুধাহাসিনীর সহিত পাড়ার মেয়ে টেঁপুদির গোলাপ জল পাতানোর উৎসব।

দুজনে তো পরম বন্ধুই ছিল! তবু সহসা টেঁপুদির বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়ায়, দুই সখি কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাপ জল পাতাইতে বসিল!

আমাদের সেই রাংচিতা গ্রামে এমন কোনও মেয়ে বৌ, সধবা বিধবা, ব্রাহ্মণ বা বাগদি বাউরি যাই হোক ছিল না, যাহাদের কাহারও সহিত কাহারও কিছু পাতানো না থাকিত।···ওটি যেন জীবন চর্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নারী জীবনে একটি চিরবান্ধবী থাকা একান্ত আবশ্যক।

কেন? তাহা বুঝিতাম না!

কই, পুরুষদের মধ্যে তো এমন প্রথা দেখি নাই।

কদাচ যদি সমবয়সী দুটি পুরুষের মধ্যে নামে নামে মিল দেখা যাইত, তাহা হইলে মিতে পাতানোর রেওয়াজ একটা ছিল বটে। তবে কত ক্ষেত্রেই বা তেমন নামে নামে মিল দেখা যাইত? আর সেও ওই কেবলমাত্র মিতে।

নানা রকম নয়।

কিন্তু মেয়েদের মধ্যে সই, গঙ্গাজল, সাগর, মকর, চাঁপা ফুল, কদম ফুল, নয়নতারা, দেখনহাসি, পান সুপুরি, আবার ফ্যাসানি হিসাবে—ল্যাভেণ্ডার গোলাপ জল ইত্যাদি! অজস্র!···

কখনও কখনও তীর্থক্ষেত্রে গিয়া অপরিচিত কারও সঙ্গে হঠাৎ খুব ভাব হইয়া গেলে, অর্থাৎ নভেলের ভাষায় দর্শন মাত্র প্রেম সঞ্চার গোছের, দুজনার মধ্যে চিরবন্ধনের গাঁটছড়া বাঁধিতে পাতানো হইয়া যাইত—মহাপ্রসাদ ফুলতুলসি।

ওই সব জিনিস হাতে লইয়া শপথ বাক্য পাঠ করা হইত।

—শপথ বাক্য?

তা শপথবাক্য উচ্চারণ করিতে হইত বৈ কি!

এই পাতানো মানেই তো সম্পর্ক বন্ধনের অঙ্গীকার।···রাজস্থান নামক একটি গ্রন্থে পড়িয়াছি রাজপুতানা অঞ্চলে রাখি পূর্ণিমার দিনে মেয়েরা হাতে বাঁধিবার রাখি পাঠাইয়া যে রাখি ভাই পাতাইতো তাহা সেই ভায়ের কাছে অমোঘ বন্ধন স্বরূপ হইত। বিপদে আপদে নিজের ভাইয়ের অধিক দায়িত্বে রাখি ভগিনীকে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিত।

এমন কি কখনও নিজের সহোদর ভাইও যদি ভগিনী সম্পর্কে বিশ্বাস-ঘাতকতা বা শত্রুতা করিত, রাখিভাই কদাচ নয়।

সই পাতানোর ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

নিতান্ত নিকটজন এমন কি মায়ের পেটের বোনের সঙ্গেও যদি বা কখনও সম্পর্কে চিড় ধরিত, ওই পাতানো সম্পর্কে নয়। এ যেন একটি পরম পবিত্র ব্যাপার।

সেইটিই শপথ বাক্যের ফল।

তখন ওই বাক্যের মর্ম তেমন না বুঝিলেও, পরে বুঝিয়াছি।

মেজদি আর টেঁপুদি হাতের তেলোয় এক একটি গোলাপ ফুল ও একটু গঙ্গাজল রাখিয়া পরস্পরে উচ্চারণ করিল, ভাই গোলাপ জল! জন্ম জন্মান্তর যেন আমরা দুজনায় গোলাপজল থাকি। আমাদের মন প্রাণ এক থাকুক। আমাদের ভালবাসা চিরদিন চিরকাল বজায় থাকুক। গোলাপের মতো সুগন্ধ থাকুক। চিরজন্ম আমি তোমার! তুমি আমার!

তারপর কানে কানে বলিল তিন সত্যি! তিন সত্যি তিন সত্যি!

তখন মা ঠাকুমা যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন গাইড দিতে, তাঁহারা উলু দিয়া উঠিলেন।

মেজদি আর টেঁপুদি হাত ধরাধরি করিয়া লক্ষ্মীঘরে প্রণাম করিয়া আসিয়া, গুরুজনদের সকলকে প্রণাম করিল। সকলে উহাদের আশীর্বাদ

করিয়া হাতে হাতে একটি করিয়া মিষ্টি দিলেন।

এই সবের আগে দুজনেই স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইয়া কোরা নতুন ডুরে শাড়ি পরিয়াছিল। এবং পায়ে আলতা ও কপালে টিপ পরিয়াছিল। আমাদের শৈশব বাল্যে ওইটুকুই ছিল মস্ত প্রসাধন।

এই সবের পর কাছে পিঠের চেনা জানা সমবয়সী কিছু মেয়েদের সঙ্গে লইয়া পায়েস খাওয়া পর্ব!

সখি পাতানোয় খরচপত্র থাকে কিছু। তবে যার যেমন সাধ্য।

টেঁপুদিরা একটু গরিব ছিল। তাই—ঠাকুমা নিজে এই উৎসবের উজ্জ্বক আয়োজনের ভার লইয়া ছিলেন। তাহারই শখে, শুধু পায়েস মুখ এর জায়গায় রীতিমত মাছ ভাত ভোজ খাওয়ানো হইয়াছিল। অবশ্য একরকম মাছই। পুকুরে জাল ফেলিয়া যা উঠিয়াছিল।

ঠাকুরদা নিরামিষ খাইতেন, তাই সংসারের সব রান্নাই পিসঠাকুমার হেঁসেলে রান্না হইত। শুধু ছোট খুড়ি কি সেজ খুড়ি ন খুড়ি আলাদা রান্নাঘরে ভাত ও মাছ রাঁধিতেন। সেও একদম কাচা কাপড়ে।

মা ও মেজ খুড়িকে সর্বদা তসর শাড়ি পরিয়া উপস্থিত থাকিতে হইত নিরিমিষ্যি ঘরে। পিসঠাকুমাই রাঁধিতেন বটে তবে হাতে হাতে সব জোগাড় করিয়া দিতে হইত। পান থেকে চুন খসিলে, রক্ষা ছিল না!

তা রান্নার হাত ছিল তাঁহার একেবারে অপূর্ব। যে খাইত ধন্যি ধন্যি করিত। মেজদির বন্ধুরাও করিল। অবশ্য খুব লজ্জা আর ভয় ভয় ভাবে। পিসঠাকুমার সামনে কে গলা খুলিবে?

তবে তিনি গলা খুলিয়া যা বলিয়া উঠিলেন, তাহাতে আমার মনে বড় দুঃখ ভাব আসিল।

মেজদি ও টেঁপুদিকে আশীর্বাদ করিয়া কিনা বলিলেন, এই যে দুজনে মন্তর পড়ে বন্ধু হলে, এ সম্পক্কো নিজের মায়ের পেটের বোনের থেকেও অধিক, তা মনে রেখো বাছা! শুধু একা একা নয় দুজনার স্বামী পুত্তুর নাতি পুতি পর্যন্ত সব আপন জন হয়ে যাবে!

এতে দুঃখ কেন?

দুঃখ হবে না? মেজদি আর আমি পিঠোপিঠি। মেজদি আমায় দুবছরের ছোট বলিয়া নিজের দলের বলিয়া মনে না করিলেও আমার কাছে মেজদি গুরুতুল্য। সেই মেজদি কিনা অন্য বাড়ির একটা মেয়ের বেশি আপনজন হইয়া গেল? কী দরকার? আপনজনের অভাব আছে সংসারে?

পরে এক সময় ঠাকুরদার কাছে গিয়া প্রশ্নটি করিয়া ছিলাম।

আচ্ছা ঠাকুরদা এত এত তো আপনজন রয়েছে। তবে আবার আপনজন

তৈরি করার দরকারটা কী ? গাদা গাদা আপনজন চাই ?

তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ছোড়দি ?

আদর করিয়া তিনি আমায় ছোড়দি বলিতেন ।

আমি মেজদির ব্যাপারটা বলিয়া ক্ষোভ ভাবে বলিলাম নিজের বোনেদের থেকে অধিক আপন হবে ? এর কোনও মানে আছে ? কী দরকার এইসব পাতাবার ? ঠাকুরদা আস্তে বলিলেন দরকার ; তা দরকার একটু—আছে বৈকি ভাই ! এ হচ্ছে পরকে আপন করার শিক্ষা । মনকে বড় করবার ছড়িয়ে দেবার শিক্ষা । এখানে তো স্বার্থ সম্বন্ধ নেই । অথচ গভীর সম্বন্ধ গড়ে ওঠে !

আমার খুব দুঃসাহস ছিল । ঠাকুরদার সহিতও তর্ক করিতাম । অন্যরা অবাক হইত ।

বেশ ক্ষোভ ভাবেই বলিলাম, তাই বলে পাতানো সম্পর্কের এত দাম হবে ? সবথেকে আপন হবে ? আহ্লাদ ।

পাতানো সম্পর্ক ।

ঠাকুরদা হঠাৎ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, আরে পাগলি একটা পাতানো সম্পর্কই তো সংসারে সবচেয়ে আপন রে । এই যে তোর ঠাকুমা ? তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পাতানো কিনা ? তার আগে চিনতাম ? কেউ কাউকে চোখেও দেখেছি ? তো তোর ঠাকুমার আমার থেকে আপনজন আর কেউ আছে ? জিজ্ঞেস করে দেখগে না । শুনগে, কী জবাব দেয় ।

ঠাকুরদা এই রকমই ছিলেন । এমনিতে রাশভারি মানুষ । সর্বদা পুঁথিপত্র বই কাগজ লইয়াই থাকিতেন । কিন্তু শিশু বা বালক বালিকাদের সহিত কথার সময় বেশ জোর হাসিতেন ।

এমন কি বিশু যখন কথা শিখিয়া বলিত থাতুন্দা তুমি ঘোলা হবে ? আমি হ্যাৎ হ্যাৎ কলব !

তখন অনায়াসে তাই করিতেন ।

তা সে দিন পিতামহীর কাছে প্রশ্নটি করিতে হঠাৎ কেমন লজ্জা বোধ হইয়াছিল । তবু বলিয়া ফেলিয়াছিলাম । তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, বুড়োর দেখি তোর সঙ্গে যত মস্করা ! কী হয় না হয় পরে বয়েস হলে বুঝবি !

আজ প্রতিনিয়তই বুঝিতেছি । এ জগতে অমন আপন আর কে আছে ?



॥ ৬ ॥

নিত্যকার দিনলিপি লেখাই হয় না।

কেবলই অতীতে দেখা মানুষদের মুখগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। কথাগুলি কানে ধ্বনিত হয়। আর তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যেন নতুন করিয়া বোধের জগতে ধরা দেয়। ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়া ওঠে, ইচ্ছা হয় তাঁহাদের কথা আরও লিখি। এমনকি আমাদের সেই গ্রামের বাড়ির পুরনো লোক হরিমতী পিসি-র কথাও লিখেতে ইচ্ছা হয়। হরিমতী পিসি না কি আমার বাবাকেও মানুষ করিয়াছিল। তদবধি বাড়িতে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মানুষ করার ভার তারই উপর।

শিশুরা তাহার প্রাণ। তাহাদের ব্যাপারে একটু উনিশ বিশ হইলে, পিসি শিশুদের মায়েদেরও দুই কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না। রাত্রে শিশু কাঁদিলে, তাহার মায়ের কাছ হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইত।

কিন্তু থাক সে কথা। এভাবে লিখিতে বসিলে অথৈ সমুদ্রে পড়িয়া যাইব। দিনলিপিতে হাত পড়িবে না।

আজ এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া বসিল যে দিনের কথাটি না লিখিয়া পারিতেছি না।

আমার এই দিনলিপির খাতাখানি তো একান্তই লুকাইয়া রাখি। লিখিও লুকাইয়া। সেই কারণেই লেখা অগ্রসর হয় না। মনের মধ্যে হাজার কথা ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় অস্থির হইতে থাকি। কোনটা ছাড়িয়া কোনটা লিখিব।

তো আজ বাড়ির কিছু জন অর্থাৎ খুড়শাশুড়িরা, জায়েরা পাড়ায় কোন একটি বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজার কথা শুনিতে গিয়াছেন, আমার যাইবার পক্ষে বাধা ছিল তাই যাই নাই।

অতএব নিশ্চিন্ত মনে খাতাটি লইয়া বসিয়াছি এবং অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ খাতার পাতায় একটু ছায়া পড়িল। চমকিয়া পিছনের দিকে তাকাইতে একেবারে লজ্জায় অবশ হইয়া গেলাম।

পিছনে দাঁড়াইয়া স্বামী।

কী কাণ্ড!

কখন আসিয়াছেন টের পাই নাই।

তাড়াতাড়ি খাতা উল্টাইয়া রাখিতে গেলাম, তিনি আমার পিঠে একটু আলতোভাবে হাত রাখিয়া বলিলেন, আহা এত লজ্জা কিসের? মনে হচ্ছে যেন, চুরি করে আচার খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছ।

ওঁর এইরকম কথাবার্তা।

বলিলাম, আহা। কথার কী ছিরি। চুরি করতে গিয়ে—আর তুলনা মনে এল না!

উনি বলিলেন, তা এল না বটে। ছেলেবেলায় নিজেরাও ওই কর্মটি করতাম কিনা। তবে এখন বোধহয় বলা উচিত ছিল যেন পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখতে বসে ধরা পড়ে গেছ।

আঃ! আবার বিচ্ছিরি কথা।

তা কী করব? আমার কথাই ওইরকম। অনেকে ঠাট্টা বোঝে না বলে চটাচটিও হয়ে যায়। যাক— ভালই তো লিখছ কিছু দেখলাম। চাপা দেওয়ার কী দরকার?

তারপর খাতাটা আর একটু টানিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, এতো দেখছি অনেকটা যেন স্মৃতি কথা মতো। দিনলিপি মানে হচ্ছে তো রোজনামচা! কিন্তু এতো সুন্দর হাতের লেখা তোমার এ কী বিশ্রী খাতায় লিখছ? পেলে কোথায় এই চোতা কাগজের খেরোর খাতা? সরকার মশাইয়ের ফেলে দেওয়া জিনিস বুঝি?

শুনিয়া তো রাগিয়াই অস্থির আমি।

বলিলাম, আমি বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে সরকার মশাইয়ের ফেলে দেওয়া খাতা কুড়িয়ে এনেছি।

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

বলিয়া জোর হাসি। এবাড়ির এই ধরন। পুরুষদের সকলেরই জোরে কথা জোরে হাসি। আমার স্বামীরও তাই। তবে বুঝিয়া সুঝিয়া জায়গা-মতো হাসিতে হয় তো।...ঘরের মধ্যে বৌয়ের সহিত কথা কহিতে জোর হাসিটা তো সমীচীন নয়। গুরুজনদের কানে যাইলে কী মনে করিবেন?

কিন্তু সে কথা বলিয়া সাবধান করিতে গেলে পাছে রাগ করেন, তাই বলিতে সাহস হয় না।

তাড়াতাড়ি বলি, এতে এত হাসির কী হল?

উনি বলিলেন, তোমার ছেলেমানুষি রাগ দেখে!

তাহার পর বলিলেন, এই পচা খাতায় লিখতে হবে না। আমি তোমায় ভাল খাতা এনে দেব।

লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিলাম, ভারি তো লেখা। তার জন্যে আবার ভাল খাতা।

উনি বলিলেন, ভারী তো হালকা তো বলে কিছু নেই। লেখা হল গিয়ে মা সরস্বতীর ব্যাপার। কাজেই পবিত্র জিনিস। সরস্বতীর বাহন হাঁসের পালক থেকেই তো প্রথম কলম কাঠির সৃষ্টি। তা জানো তো? চিরকাল তাই চলে এসেছে। আমার বাবা জ্যাঠামশাইদেরও তাই লিখতে দেখেছি। এখন অবশ্য নিব পরানো বিলিতি কলম চালু হচ্ছে। তোমার এই কলমটি যেমন। এর নিব আর আছে?

আসলে এই কলমটি আমার বাবা আমায় এখানে আসবার আগে দিয়াছিলেন, বাপের বাড়িতে চিঠি দিবার জন্য। সঙ্গে কিছু পোস্টকার্ড।

বলিয়াছিলেন, এখানে চিঠি দিতে সবসময় পোস্টকার্ডেই লিখবি না। না হলে ওখানে অন্যের কৌতূহলের কারণ হবে।...যাকে চিঠি পোস্ট করতে দিবি, সে হয়তো বন্ধ খামের মধ্যে চিঠি দেখলে ভাববে, না জানি কী লিখেছে বৌ। শ্বশুরবাড়ির লোকের নিন্দে টিন্দে করেছে কিনা।

আমি অবাক হইয়া বলিয়াছিলাম, শুধু শুধু ও কথা বলবে কেন বাবা?

বাবা একটু গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলিয়াছিলেন, সংসার এমনই জায়াগা মা, শুধু শুধু অনেক কিছু ভাবে। অনেক কিছু ঘটে।...সাবধান হওয়াই ভাল। তাছাড়া বেশি লেখার তো কিছু নেই। একটা কুশল প্রশ্নের আদান প্রদান বৈ তো নয়। তার জন্যে পোস্টকার্ডই যথেষ্ট।...তুমি লিখতে পড়তে শিখেছ,

তাই এই সুবিধে, তাছাড়া— জামাইও শহরের শিক্ষিত ছেলে। তাই ভরসা। গ্রামের কটা মেয়ের এমন হয়? কটা মেয়েই বা চিঠি লিখতে পারে? বা নিজে লেখার কথা ভাবতে পারে? পারলেও বাপের বাড়িতে চিঠি লেখা, শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা তো তেমন সুনজরে দেখে না।

তো সেই কলমটিই আমার প্রাণ।

ঘাড় নাড়িয়া স্বামীকে বলিলাম, দুটো নিব ছিল, আর একটা আছে।

উনি কলমটা তুলিয়া নিয়া একটু দেখিয়া বলিলেন, ঠিক আছে।

তাহার পর এটা সেটা কথা। তখন তো আর লেখা হইল না হওয়ার কথাও নয়। উহাকে কাছে দেখিলে প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ হিল্লোল বহিতে থাকে, তাহাতে আর কিছুই মনে থাকে না।

আমার স্বামীই নাকি ওঁর অন্যান্য ভাইবোনেদের মধ্যে দেখিতে কম সুন্দর। রং-ও একটু ময়লা।

আমার বড় ননদ বলেন, মা মরে যাবার আগে একটা কালো কোলো ছেলেকে আমাদের কাছে ফেলে দিয়ে দিব্যি—ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। এই কালোটাকে মানুষ করতে রইলাম এই মুখপুড়ি।

এই ধরনের কথা শুনিলে আমার যেন গা কেমন করে। আমাদের রাংচিতা গ্রামে এ ধরনের কথা শুনি নাই। এ বাড়িতে সর্বদা এই ধরনের বেপরোয়া কথার চাষ। তবে ক্রমেই সহিয়া যাইতেছে।

আসলে আমার ওই বড় ননদের কপাল মন্দ। তাই স্বামীর গৃহে না যাইয়া বিবাহ পর্যন্তই পিতৃগৃহে পড়িয়া আছেন। শুনিতে পাই উহার স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত তাই জানিতে পারিয়া উনি পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন, ঠিক করেছিস। আর যেতে হবে না। তোর বাপ ঠাকুরদার ঘরে দুটো ভাতের অভাব হবে না।

তা তিনিই অতি শৈশবে মাতৃহারা কনিষ্ঠভ্রাতাকে মানুষ করিয়াছিলেন। বয়সে মাত্র দশ বারো বছরের বড় হলেও স্নেহে মায়ের মতেই। ছোট ভাইটির জন্য সর্বদা প্রাণ পড়িয়া থাকে।

তবে এখন তিনি গুরুদীক্ষা লইয়া সর্বদা পুজা আর্চা জপ তপ লইয়া থাকেন। এবং বৎসরের অধিকাংশ কালই তীর্থ ভ্রমণে কাটান। সঙ্গী জুটিলেই হইল।

বিষম নিষ্ঠা কাষ্ঠা। বিধবা না হইয়াও প্রায় বিধবার মতো আচার বিচার। পাড়ওয়ালা শাড়ি পরেন, এই যা। আহা যখন চওড়া লালপাড় গরদের শাড়িটি পরিয়া পুজার ঘর হইতে নামেন, দেখিলে দেবী মূর্তির মতো লাগে।

আমার ওই বড় ননদ সুষমা সুন্দরীকে বাড়িতে সকলেই সমীহ করে।

যদিও তিনি আদৌ রাগি নন। কেবলমাত্র অতিরিক্ত আচার পরায়ণ। সেই বিষয়ে যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, সেটি দেখিতে সকলেই তৎপর থাকে।

ব্যতিক্রম শুধু আমার স্বামী।

তিনিই হাসিয়া হাসিয়া বলেন, ও বড়দি, কেন মিথ্যে ফোঁটা তেলক পরে বসে কচুঘেঁচু খেয়ে মরছ? এসো না আমাদের সঙ্গে দুখান ইলিশ মাছ ভাজা, পার্শের সর্ষে ঝাল, মৌরলার অম্বল নিয়ে বসে পড়ো না!

অবশ্য বিধবা তো নয়, বলিতে দোষ কী?

বড়দি রাগ দেখাইয়া বলেন, এই একটা ফাজিল কেষ্ট হয়েছে। আর কেউ তো তোর মতো নয়রে পাজি?

পাজি হাস্যবদনে বলে, তোমার মানুষ করার গুণ!

তবু আমার তাঁহাকে কেমন ভয় ভয় করে। মনে হয় তাঁহার একান্ত ভালোবাসার জিনিসটির উপর আমার প্রভাব পড়ায় মনের মধ্যে কোন দুঃখ নাই তো? স্বামী আমার ঘরে বসিয়া হাসিয়া উঠিলে প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া ওঠে।

অথচ বড়দি তো তেমন নয়।

কেন আমার এমন ধারণা? মনে হয় আহা চিরবঞ্চিতা মানুষটা। হয়তো নিঃশ্বাস পড়ে। একি আমারই মনের পাপ?

সত্য বলিতে একদিন স্বামীর কাছে এই ধারণার ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলাম, আচ্ছা এত জোরে হাসো কেন? দিদি কী মনে করবেন?

স্বামী কেমন একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ও নিয়ে তুমি ভাবনা কোরো না। বড়দির বড় গাছে নৌকো বাঁধা আছে।

সে তো জানা কথাই কে না জানে?

সেই বড়গাছ তো ঠাকুর দেবতাই। তবে ওঁর হাসিটা অমন রহস্যময় কেন?

যাক আজ সেই বড় ননদ বাড়ি নাই। সমস্ত মেয়ে বাহিনীর পাণ্ডা হইয়া পাড়ার সত্যনারায়ণ পুজোয় গেছেন।

শুনিয়াছি খুব ঘটার পুজো। বাড়ির একটি ছেলে ভাল করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করা বাবদ জোড়া সত্যনারায়ণ পুজো দিতেছেন।

অর্থাৎ দুইপ্রস্থ শিন্নি।

এখানে কলকাতায় সত্যনারায়ণের শিন্নির খুব চল। আমাদের রাংচিতায় এতটি দেখি নাই। সেখানে সব কিছুতেই গ্রাম দেবতা বুড়ো শিবতলায় পুজোর প্রচলন।

তবে বাড়িতে কোনও বিয়ের পর সুবচনী ও সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়া দেখিয়াছি।

আমার বিবাহে অষ্টমঙ্গলার দিনই তাড়াহুড়া করিয়া ওই দুটি পুজা সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেটি মনে আছে। কারণ, আমার স্বামী সেইদিনই কলিকাতায় ফিরিবেন।

আমার ভাগ্যে বিবাহের পর এক বৎসর বাপের বাড়ি থাকার পর তবে দ্বিরাগমন তা আর হয় নাই।

দ্বিরাগমন শব্দটি ঠাকুরদার মুখেই শোনা। মেয়েরা সকলেই ঘরবসত বলিত। সেই সময় কন্যার সঙ্গে বিবাহের দান সামগ্রীর থেকে অধিক জিনিস-পত্র দিয়া মেয়েকে পতিগৃহে পাঠানোর নিয়ম।

আমার সে সব কিছুই হয় নাই। কারণ এখান হইতে বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল, এখন আর অমন কঠোরভাবে এক বছর বাপের বাড়ি থাকার চল নেই। মেয়েদের বয়স হয়ে বিয়ে হয়। ধুলো পায়েই ঘরবসত করিয়ে নেওয়া হয়। কলকাতায় অত মানামানিও নেই। তাছাড়া—

বয়স হওয়া মানে আমার বিবাহ হইয়াছিল সাড়ে বারো বছর বয়সে।··· স্বামী তখন বি এ পাস করিয়া ল কলেজে পড়িতেছেন।

তাছাড়া— ইহাদের যেন ওই ঘরবসত নামক ব্যাপারে কতকগুলো জিনিসপত্র দিয়া বিব্রত করা না হয়। বাড়িতে ওইসব বাসনপত্র শিলনোড়া বঁটি কাটারি জাঁতা কুলো চাকি-বেলুন ইত্যাদি প্রভৃতির পাহাড় মজুদ আছে। যত যত বৌ এসেছে সঙ্গে এসেছে একডাই করে। তাছাড়া সংসারের তো ছিলই। আর মেয়েকে এসব দেওয়া মানেই, মেয়েকে ভিন্ন সংসার পাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এ বাড়িতে ও প্যাটার্ন চলবে না।

শুনিয়া ঠাকুরদা বলিয়াছিলেন, দেখা যাক কতদূর চলবে। তবে যুক্তিটা অদ্ভুত। আসলে বড়লোকের ঘরে আমাদের মতো গরিবের দেওয়া জিনিস মানাবে না তাই!

কী জানি ঠাকুরদার কথাই ঠিক কিনা। সত্যই এ বাড়ির যাবতীয় জিনিস-পত্রই বেশ দামি দামি, আর সুন্দর সুন্দর। তাহা আসিয়াই দেখিয়াছি!

কেবলই মনে হইত এরা কী বড়লোক। বড়দের খাইতে বসিবার ঘরে সারি সারি যে ঠাঁই করিতে হইত তাহা আমাদের রাংচিতার মতো কাঠের পিঁড়ি নয়, সব কার্পেটের সুন্দর নক্সা আসন। সেইসব আসন না কি অনেক-গুলিই বাড়ির মেয়ে বৌদের হাতে বোনা। কার্পেটের আসন বুনিতে জানে না এমন মেয়ে কমই আছে এখানে। কার্পেটের আসন, মখমলের জুতা বানানো, তত্ত্ব তাবাস পাঠাইবার সময় ঢাকা দিবার খুঞ্চেপোষ, এবং দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিবার কার্পেট বোনার কাজের মতো পদ্যলেখা ছবি বোনা, এ সব না শিখিলে লজ্জার কথা।

এ বাড়ির ঘরে ঘরে দেওয়ালে টাঙানো সব ছবির পদ্য হইতেছে— সংসার

সুন্দর হয় রমণীর গুণে— সংসার শ্মশান সম রমণী বিহনে।

পতি বিনা রমণীর নাই কোনও গতি !

পতিই জীবন ধন, মনে জেনো সতী !

অথবা— দেবতার সার শিব ভোলানাথ।

সংসারের সার হে, আমার নাথ।

এসব পদ্য কার্পেটের নমুনাতেই লেখা থাকে নাকি ! কেবলমাত্র ঘর গুনিয়া গুনিয়া ছুঁচ ফলাইলেই লেখা হইয়া যায়।

তো আমি গ্রামের মেয়ে এসব কাজ টাজ জানা ছিল না। এজন্য সকলেই অবাক হইত। তাহাতে লজ্জা পাইতাম।

আমার কিন্তু আবার এইরকম লেখা দেখিয়া কেমন লজ্জা করিত। মনে হইত— গুরুজনেরা তো দেখিতেছেন। এত পতি পতি প্রাণধন ইত্যাদি তাহাদের চোখে পড়া লজ্জার বিষয় নয় ?

আমার এক ভাসুরপো বৌয়ের ঘরে আবার দেওয়ালে টাঙানো— দেখিতে পাই

পতি সারৎসার, পতিই সংসার

পতিই প্রাণের ধন ! শতজন মাঝে

পতিকে হেরিলে, জুড়ায় নয়ন মন !

এ পদ্য নাকি তাহার নিজের বানানো। দোকানের কেনা প্যাটার্ন নয়।

সেকথা শুনিয়া আমিই লজ্জায় সারা।

দোকানের জিনিসের কথা আলাদা, কিন্তু নিজে বানানো ?

কথাটা তো চাউরই হইয়াছে শ্বশুর ভাসুর দেখিতেছেনও। ইস ! কই ইহাতে তো কেউই বৌ বেহায়া বলিয়া নিন্দা করে না।…অথচ ঘোমটা একটু কম হইলেই কী নিন্দা ! ঘোমটা কি কেবল মুখের জন্যই ? মনের জন্যও ঘোমটার প্রয়োজন নাই ?

যদিও কথাটা খুবই সত্য। ওই শতজন মাঝে পতিকে হেরিলে জুড়ায় নয়ন মন।

এতো আমারও প্রাণের কথা।

এই যে খাইবার ঘরে রাত্রে পুরুষজনেরা সকলে একত্রে দুই সারি হইয়া খাইতে বসেন, তখন ঘোমটা দিয়াই সেই ঘরে পরিবেশনের ফাইফরমাস খাটিতে যাওয়া আসা করিতে পাই। যেমন দুধের বাটি জলের গ্লাস লেবু লবণ আচার কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি দিয়া আসিতে হয়। তখন স্বামীকে ঘোমটার আড়াল হইতেই কি একটু দেখিয়া লই না ? আর দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইয়া যায় না ? যতবার দেখি ততবারই যেন প্রাণটা আহ্লাদে ভরিয়া ওঠে।

তাহা বলিয়া সে কথাটি কি লোকের কাছে প্রকাশ করিবার ?

আমি গ্রামের মেয়ে তাও নেহাত গৃহস্থ ঘরের।

শহরের বড়লোকদের আচার আচরণ আমাদের সহিত খাপ খাইবার কথা নয়। তাই আমার চিন্তাধারা অন্য !

কিন্তু আমার এই অসম বিবাহটি ঘটিল কীরূপে ? এমন যোগাযোগ হইল কেমন করিয়া ?

তা সে কথা নিজমুখে বলিতে অথবা নিজ হাতে লিখিতে লাজলজ্জার মাথা খাইতে হয়। কেউ দেখিবে না এই যা ভরসা।

কারণটি নাকি আমার রূপ। একটি বিয়ে বাড়িতে আমায় দেখিয়া আমার বড় ননদ নাকি আমাকে ভাইবৌ করিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন।

এই ভাইটিই যে তাঁহার নিজস্ব।

কাজেই সব বৌদের থেকে সেরা বৌ আনিবার বাসনা ছিল মনে মনে। নানা জায়গায় কনে দেখিয়া বেড়াইতে ছিলেন। আর কোনও না একটু খুঁত বাধাইয়া নাকচ করিয়া দিয়া, আবার নতুন উদ্যমে কনে খোঁজেন। আমাকে অবশ্য খুঁজিয়া বার করেন নাই আকস্মিক আমাকে দেখা মাত্রই হঠাৎ কেমন চোখে লাগিয়া গিয়াছিল। ব্যস। আর বাধা মানেন ? নাঃ মানিলেন না।

বিয়ে বাড়িটা ছিল শিয়ালদায় আমার এক মাসতুতো বোনের। মায়ের ওই দিদিটি ছিলেন বেশ বড়লোকের বাড়ির বৌ।

আমার মা সে বাড়ির উপযুক্ত শাড়ি গহনা নাই বলিয়া আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু মাসি বিশেষ করিয়া বলিয়া যাওয়ায়— এবং আমার বাবার ব্যঙ্গ হাসির ফলে যাইতে হইয়াছিল।

বাবা বলিয়াছিলেন, তোমার দিদি যদি তোমার শাড়ি গহনাকেই নেমন্তন্ন করেছেন বলে মনে করে থাকো, তাহলে না যাওয়াই ভাল।

মা কাঁদিয়া বলিলেন, আমি তাই বলেছি, অন্য সবাইয়ের থেকে শ্রীহীন হয়ে কাজের বাড়িতে গেলে তোমারই মান মর্যাদার হানি।

বাবা বলিলেন, আমরা পণ্ডিতের বংশ। আমাদের মান মর্যাদা সাজ-পোশাকের মাপে মাপা হয় না।···আমরা তো টুলো পণ্ডিত কলকাতার হাতিবাগানের টোলের থেকে আমার বাবাকে যাবার জন্যে কত সাধাসাধি করে তা জানো ? বাবা গ্রামটাকে কানা করে চলে যেতে চান না। বলেন, একে একে সকলেই তো বেশি আয় উপায় হবার আশায় চলে গেছে। আমিও চলে যাব ? স্রোতের শ্যাওলার মতো সব্বাই ওই কলকেতা শহরে গিয়ে পড়ে একত্রে জমতে হবে ? বুনো রামনাথের নাম শুনেছো ছোট বৌ ? জানো তাঁর গৃহিণীর কথা ?

মা আবারও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার ঘাট হয়েছে। যাব। শুধু শাঁখা হাতে মোটা লালপাড় শাড়ি পরেই যাব।

যাইবার সময় তা অবশ্য যান নাই। ঠাকুরদা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ কী? ছোট বৌমা এইভাবে কুটুমবাড়ি যাচ্ছ?

ঠাকুমা বলিলেন, তা যাবে না কী করবে? তোমার আদর্শওলা পুত্তুর বৌটাকে বুনো রামনাথ না কী দেখাল, তাতেই বৌটা কেঁদেকেটে—এইভাবে—

ঠাকুরদা হাসিয়া কহিলেন, আদর্শ ভাল! তবে কালধর্ম মানতেই হয়। বুনো রামনাথের কাল আর নেই। ছেলের কথা এখন বাদ দাও! তুমি পারো তো একটু ভদ্রস্থ করে দাও।

তাই শুনিয়া ঠাকুরমা নিজের প্যাটরা হইতে একখানি চওড়া লালপাড় নতুন গরদ শাড়ি বাহির করিয়া মাকে পরিতে দিলেন। এবং নিজের গলার গোটহার ও বাক্সে তোলা অমৃতি-পাক বালা বাহির করিয়া মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পরাইলেন।

শুনিলাম ওই গোট হারটি না কি ঠাকুরমা তাহার প্রথম পুত্র জন্মানোর কালে সাধভক্ষণের সময় পাইয়াছিলেন, এবং ওই বালাজোড়াটি দিয়া ঠাকুরমার শ্বশুর পুত্রবধূর পাকা দেখার সময় আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাই ঠাকুরমা ওই দুটি মেয়েদের বিবাহের সময় বা ছেলেদের বিবাহে বৌদের জন্যও হস্তান্তর করেন নাই। কারণ ওই দুটি নাকি তাহার কাছে খুব পবিত্র আর শুভকারী ছিল! অর্থাৎ পয়মন্ত।

কিন্তু আমার মাও কি বিবাহকালে তেমন কিছু পান নাই?

পাইবেন না কেন? পিতৃকুল শ্বশুরকুল দুপক্ষ হইতেই কিছু না কিছু তো পাইয়া ছিলেন। নিতান্ত দরিদ্র কোনও পক্ষই নয়। তবে আমার দুই দিদির বিবাহের সময়, মা সংসারের সাহায্যার্থে প্রায় সকল গহনাই দিয়া দিয়াছিলেন, ভাঙাইয়া পাত্রপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী নতুন করিয়া গড়াইতে। কেবলমাত্র স্যাকরার দোকানে বাণি লাগিয়াছিল। তো সেই বাণি তো ধার রাখিয়া অল্পে অল্পে শোধ করিলেও হয়।

আমার বিবাহে?

সেও তো অন্য প্রকার। ইঁহারা তো বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনও চাহিদা নাই। কন্যাদান করিতে কন্যাপক্ষ তাহাদের সাধ্যমতো যা পারিবেন দিবেন।

পরে শুনিয়াছি এতটা উদারতার কারণ আমার বড় ননদ বড়দির ব্যস্ততা। তাঁহার নাকি মনে হইতেছিল কথা বাড়িতে বাড়িতে, পাছে ওই মেয়েটি হতছাড়া হইয়া যায়।

এমনিতেই তো কথা আছে লাখকথা না হইলে বিবাহ হয় না।

তবে ওই হাতছাড়া হইবার ভয়টা বড়দির একেবারে অমূলক নয়।

শহর কলকাতায় বড়মানুষের ঘর শুনিয়াই ঠাকুরদা ইতঃস্তত করিতেছিলেন কিছু কিছু। বলিতেছিলেন আমরা কি ওদের সঙ্গে পেরে উঠব ছোট খোকা? ভেবে দ্যাখ।

বাবা বলিয়াছিলেন, আমি আবার কী ভাবতে যাব বাবা? আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!

ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, তোমাদের সব অনাছিষ্টি। ভাল ঘর বর, বংশও উচ্চ। তোমরাই তো বলো কুলিনের সেরা হচ্ছে মুখুজ্যে! এত ভাবাভাবি কী? মেয়ের ভাগ্যে অযাচিতভাবে এমন পাত্র এসেছে। আর তোমরা হাতের লক্ষ্মী ঠেলে ফেলতে চাইছ? তোমাদের বড় মেয়ের মতন দারিদ্দির ঘর, আর মেজ মেয়ের মতন কসাইয়ের ঘর হলেই ভাল হত? শহরের লোক ওদের মতন অসভ্য চশমখোর হবে না।...দেখেছ তো মেজটা যখনি বাপের বাড়ি আসে একেবারে একবস্ত্রে! শাশুড়ি নাকি ওর প্যাঁটরা বাক্সয় ওকে হাত দিতে দেয় না। চাবি নিজের কাছে রাখে। আর আমরা আবার যা সব দিয়ে থুয়ে পাঠাই, সবই গিন্নি নিজের মেয়ের বাড়িতে পাচার করেন। সে তো আবার পাড়ার মধ্যেই। কাজেই মিষ্টির হাঁড়িটা পর্যন্ত সোজা সে বাড়ি চলে যায়। নিজের মুখ বাড়াতে বাড়ির অন্য কেউ টেরও পায় না বৌয়ের সঙ্গে অত মিষ্টি এসেছিল।·· সেইরকম বাড়িই বুঝি খুব ভাল?·· হাসির কপালে যদি রাজপ্রাসাদ জোটে, তোমরা নিজেদের সুবিধে অসুবিধে ভেবে তার হন্তারক হবে?

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ওরে ছোট খোকা তোর মার এই লেকচারের মুখে কে দাঁড়াবে? লিখেই দিই আমাদের এই বিয়েতে খুবই ইচ্ছা আছে। আর উৎসাহ আছে। কী বলিস?

বাবা বলিলেন, অতসব? কেন শুধু— আমরা রাজি আছি বললেই হয় না?

ঠাকুরদা বলিলেন, কী যে বলিস বাবা। যতই হোক কন্যাপক্ষ! সবসময় নম্রতা দেখানোই রীতি। শুধু রাজি আছি বলবার অধিকারী পাত্রপক্ষ!··· আসলে আমার রূপসী নাতনিটিকে দেখে তাদের এত আগ বাড়িয়ে আগ্রহ দেখানো। এই তো? তা বলে মেয়ের বাপ হয়ে অহংকার দেখানো উচিত নয়। তবে কুলেশীলে খাটো হলে, আলাদা ছিল।

তা লাখ কথাটি উভয়পক্ষে না হোক, একা আমাদের বাড়িতেই হইতে লাগিল।

আমার এই অভাবিত ভাগ্যে নানাজনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। সেসব ভাবিতে বসিলে মহাভারত।

সংসারে দুইটি পক্ষ থাকেই। প্রায় সকল ব্যাপারেই। হিতৈষী পক্ষ, আর হিংসুটে পক্ষ।

কাজেই দুই রকম কথা শুনিতে হয়।

পিসঠাকুমা ঠাকুরদাকে বলিলেন, দাদা মেয়ের ভাগ্যে সম্বন্ধ এসেছে। তুমি আবার কলকাঠি নাড়তে বসছ কী জন্যে? কপালে ঠুকে ঝুলে পড়ো। তাদের সঙ্গে পারব কিনা ভাববার তুমি কে? সবই ভগবানের হাত।

আর জ্ঞাতি বাড়ির বড় জ্যোঠিমা মুখ বাঁকাইয়া কাহার কাছে যেন বলিয়া গেলেন, বড়লোকের বাড়ি বড়লোকের বাড়ি, বলে এত নাচনা গাওনা কিসের? …কথাতেই আছে মেয়ের কপাল। কাঠখড় দেখে দাও ভাতঘর হয়, আর ভাত-ঘর দেখে দাও তো কাঠখড় হয়।

ভাত ঘর, কাঠ খড় এ সবের মানে জানিতাম না। তবে মনে হইল এই কথায় হয়তো অমঙ্গল চিন্তার প্রকাশ ছিল। আড়ালে সকলে ছি ছি করিল কেন?

দেখিয়া শুনিয়া আমি ভয় খাইয়া বলিয়াছিলাম, ঠাকুমা তুমি কেন সেদিন মাকে বড়মাসির বাড়ি পাঠিয়েছিলে তোমার গহনা কাপড় দিয়ে সাজিয়ে? সেদিন ওখানে না গেলে তো এই কাণ্ডটি হত না।

শুনিয়া ঠাকুমা হাসিয়া খুন।

তবে এখন ভাবি ভাগ্যিস পাঠাইয়াছিলেন। তা না হইলে এই মানুষটিকে পাইতাম? এত ভালবাসা! এত করুণা!

মা অবশ্য বলিয়াছিলেন, তোদের ঠাকুমার শাড়ি গহনা খুব পয়মন্ত। ওইগুলো পরে গিয়েছিলাম বলেই—

আচ্ছা ঠাকুমা অত সুন্দর শাড়ি কিনলেন কবে? গা নতুন তোলা ছিল।

ওমা! শুনিলাম কেনাই নয়।

পাল বাড়ির নতুন বৌ এয়ো সংক্রান্তি উদযাপন করিতে ঠাকুমাকে প্রধান এয়ো করা বাবদ প্রণামী দিয়েছিল।

পালেরাও তো বেশ বড়লোক।

তবে বামুন বাড়ি বলে আমাদের যা মান্য করে। যেন আমরা ঠাকুর না দেবতা!

আর ওদের পুজো আচ্চা বিয়ে বা সকল কিছু কাজেই তখন বামুনের মেয়ের দরকার পড়িত।

আমাদের বাড়িটিই তাহারা প্রধান বামুন বাড়ি বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন।

উহাদের মেয়েদের বিয়েয়— আইবুড়োভাত খাওয়ার রাতে আর বাড়ির হাঁড়ির ভাত খাইতে নাই বলিয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া বলিয়া যাইতেন। আজ একটু পেসাদ রাখবেন মা। খুকির জন্যে নিয়ে যাব।

তার মানে সেইদিন সকালে— আমাদের বাড়িতে ইয়া একটি মাছ চলিয়া আসিতে, আর থরে থরে আনাজপাতি তেল মশলা এবং পরমান্ন রান্নার জন্য দুধ মিছরি, ভাল আতপচাল, বাদাম পেস্তা কিসমিস ইত্যাদি আরও কত কী সব যেন।

মেয়েও ছিল ওদের বাড়ি একগাদা। কাজেই মাঝে মাঝেই এ দৃশ্য দেখিতে পাইতাম।

আইবুড়োভাত খাইবার পর যে আর বাড়ির ভাত খাইতে নাই, তাহা দিদিদের বিবাহে দেখিয়াছি। এখন এই শহরে আসিয়া এ বাড়িতেও দেখিতেছি।

সেই রাত্রে বামুনবাড়ি আর পরবর্তী যে কদিন না বিবাহ হইতেছে। তা তখন বিবাহের বেশ কয়েকদিন আগেই— পাঁজি দেখিয়া গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দেখিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া রীতি ছিল। একালে অতটা নাই! মাঝের সেই কয়দিন রোজই উৎসব।

সেই মাঝের কয়েকটি দিন কনে কেবল মাসিপিসি বা পাড়ার লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন খাইয়া বেড়াইত।

সাজিয়া গুজিয়া এবং মাথায় খোঁপায় রুপোর কাজললতাখানি গুঁজিয়া, মল বাজাইয়া, আর একখানি কুচো বাহিনী সঙ্গে লইয়া নেমন্তন্ন খাওয়াটাই বোধহয় বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্লাদ ছিল।

কারণ তখনও পরগোত্র হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় বিষণ্ণতা গ্রাস করিয়া বসে নাই। এবং প্রাপ্তি যোগটি বেশ ভালই ছিল।

সব বাড়িতেই এই নেমন্তন্নর সঙ্গে একখানি করিয়া নতুন শাড়ি জুটিত। সেইটাই নাকি তাহাদের পক্ষের লৌকিকতা।

তবে আমাদের রাংচিতায় দেখিয়াছিলাম প্রাপ্তি নেহাতই একখানি ডুরে বা রঙিন শাড়ি। যেমন যাঁদের আলো বৌ পাগলা টিয়ারঙা এমনি সব। কালো সুতোর সম্পর্কটি মাত্র যাতে না থাকে। বিবাহে তো কালো একেবারে অচ্ছ্যুৎ! কাজেই কালাপানি বা সিঁথেয় সিঁদুর পাড়ে গঙ্গা যমুনা ডুরে কী খড়কে ডুরেও চলিত না।

তা তাইতেই তো কনেরা মোহিত।

তবে এখানে মনোহর পুকুর রোডের এই মুখুয্যে বাড়িতে আসিয়া দেখিলাম, ওই পাওনা শাড়িগুলি বেশ দামি দামি।

যেমন ঢাকাই টাঙাইল জরিপাড় শান্তিপুরী। রেশম পাড় ধনেখালি এইসব।

আমার এক ভাসুরঝি তো এদের এক আত্মীয় চক্রবেড়ের কোন বাঁড়ুয্যে না চাটুয্যেদের বাড়ি আইবুড়ো ভাত খাইতে গিয়া লাভ করিল একখানি পার্শি শাড়ি।

সে যাক এদের আত্মীয়জনেরা যে অনেকে এদের থেকে অনেক বড়লোক তা ক্রমশই জানিতে পারিতেছি।

আসলে কলিকাতা শহরটি তো বড়লোক দিগেরই বাসস্থান।

অনেক অনেক সব বনেদি পরিবার এখানে অধিষ্ঠিত। তবে সকলেই যে ব্রাহ্মণ তা অবশ্য নয়। কাজেই আত্মীয়তা সূত্রে সকলের বাড়ির কাজকর্মে নেমন্তন্ন আসে না, আসে বন্ধুত্ব সূত্রেই।

সেই সব বাড়িতে কখনও যাওয়ার সুযোগ হইলে চোখ কপালে উঠিয়া যায় তাঁহাদের জাঁকজমক জৌলুস দেখিয়া।

পাথুরিয়াঘাটায় কোন এক ধনী গৃহে কোনও এক পুজা উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেই জৌলুস বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। অথচ ইচ্ছা হয় কখনও রাংচিতায় যাইলে বাড়ির সকলের কাছে গল্প করিব।

এই সূত্রে ছেলেবেলায় পিস ঠাকুমার মুখের একটি গল্প মনে পড়িয়া যায়। গল্প এই—

একটা মাতাল পুজার সময় দুর্গাঠাকুর দেখিতে গিয়াছে— প্রতিমার সঙ্গে ডাকের সাজ! সে একেবারে ঝকমক করিতেছে।

মাতালটা দেখিয়া দেখিয়া বলিতেছে ওমা! ব্রহ্মময়ী শিবে— এত গয়না কোথা পেলি! বুঝি কলকাতার কোন বড়লোককে বাবা বলেছিলি?

কলিকাতার বড়লোক সম্পর্কে—গ্রামে এইরকম প্রবাদ প্রচলিত আছে।

তবে— একথা তো ঠিক ওইসব বাড়ির লোকরাও খুবই বিনীত নম্র, যেন নিচু ভাব।

ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বিশেষ সমীহ।

অবশ্য আমি আর কতটুকু দেখিয়াছি? তাও তো অন্তঃপুরবাসিনী। তবু সামান্য দেখাতেও একটি ধারণা তো গড়িয়া উঠিতে পারে?

কথায় আছে, চিন্তার গতি নাকি বাতাসের চাইতে অধিক দ্রুত।

কথাটা কী সত্য!

কী ভাবিতে ভাবিতে কোথায় ভাসিয়া যাই।…

সহসা চিন্তার গতিতে ছেদ পড়িল।

সহসা নিচের তলায় কলরব শুনিতে পাইলাম। নানা কণ্ঠের কল কোলাহল তার মানে, সত্যনারায়ণ কথা শোনার দল ফিরিলেন।

চাহিয়া দেখি স্বামী একমনে আমার খাতা খানাতেই চোখ বুলাইতেছেন।

আমি লজ্জায় মরিয়া টানিয়া লইয়া চাপা দিয়া রাখিয়া বলিলাম যাও যাও দেখোগে— বড়দিরা ফিরলেন বোধহয়।

তিনি উঠিয়া একটু হাসিয়া আমার গালে একটি টোকা মারিয়া চলিয়া গেলেন তুমি এমন ভাব করো, যেন আমি একটা পরপুরুষ। আর দেখা সাক্ষাৎ টাক্ষাৎ অবৈধ।

ওঃ! কী যে মানুষ!

মুখে কিছুই আটকায় না!

বাড়িতে আর কেউতো এমন নয়।

কিন্তু এই কারণেই তো আমি নিজেকে সকলের থেকে ভাগ্যবতী ভাবি।

অথচ শুনি উনি নাকি ওকালতি শুরু করিয়াই বেশ নাম করিতে পারিবেন মনে হয়। সেখানে তো বেশ গম্ভীর থাকিতে হয়।

তবে একথাও ওঁর মুখে শুনিয়াছি— ল পড়িবার ইচ্ছা নাকি তাঁহার একেবারেই ছিল না। শুধু গুরুজনদের ইচ্ছার চাপেই পড়িতে হইয়াছে।

এ বাড়ি নাকি তিন পুরুষে আইন পড়ুয়া, আইন ব্যবসায়ী! কাজেই যে ছেলেটি লেখাপড়ায় বেশি ভাল তাহার উপরই গুরুজনদের অনেকটা প্রত্যাশা। বংশের ধারা বজায় রাখিবার দায় তাহারই।

এই ঘটনার পরে কয়েকদিন বাদে আবার এক ঘটনা। এও অভাবিত।

এদিন সহসা আসিয়া নয়, রাত্রে শুইতে আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার পর গুছাইয়া বসিয়া বলিলেন, চোখ বোজো হাত পাতো! এই এই চোখ পিট পিট করবে না।

এ আবার কী ছেলেমানুষি।

আচ্ছা মানুষ।

চোখ বুজিয়া হাত পাতিলাম।

হাতের উপর যা পড়িল, মনে হইল একখানি বই।

নতুন কোনও বই বোধহয়। দেখি।

আরে তুমি যে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলে। এবার চোখ খোলো।

খুলিয়া অবাক!

এ কী! এতো বই নয়। চৌকো মাপের একটি খাতার মতো যেন।

পাতা উল্টাইয়া দেখি, খাতাই বটে। সুন্দর সাদা ধবধবে রুলটানা কাগজ। কিন্তু খাতার মলাটটি?

কেউ কখনও এমন দেখিয়াছে ?

লাল মখমলে মোড়া মলাট ! যেন একখানি গহনার বাক্স। বিবাহের সময় এঁরা আমার পাকা দেখার সময়— হেমিল্‌টনের দোকান হইতে যে কণ্ঠহার কিনিয়া আনিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি দেখিতে। প্রথমটা ভাবিলাম নতুন কোনও গহনাই হয়তো হঠাৎ উপহার দিলেন। লজ্জায় সারা হইলাম।

কিন্তু তাহার পরই ভুল ভাঙিল, মলাটে সোনার জলে নাম লেখা দেখে।

লাল মখমলের উপর সোনার জলে পরিষ্কার ছাঁদে লেখা।

শ্রীমতী দিব্যহাসিনী দেবী !

কোনও বিলাতি বড় দোকান হইতে— নাকি তৈয়ার করানো !

বলিলেন, তোমার এত সুন্দর রচনা আর ওই বাজে কাগজে লিখতে হবে না। এবার থেকে এইতে লিখবে !

ঠাকুর। এত সুখ আমি রাখিব কোথায় ? সুখে যে আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।

তবু কষ্টে চোখের জল চাপিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলাম, আহা ! এই অপূর্ব খাতায় আমি ওইসব আজেবাজে লেখা লিখব ? এতে আমি ভাল ভাল গান তুলে রাখব।

স্বামী বলিলেন, আরে। তুমি গানও লেখো নাকি ?

আমি তো হাসিয়া অস্থির।

গান লিখিব আমি ?

কেন, ভাল ভাল গান পাইলেই বা শুনিলেই লিখিয়া রাখে না মানুষ ? আমি তো রাখি।

ছেলেবেলায় ঠাকুরদার কাছ হইতে পাওয়া কিছু কাগজ পাইয়া তাহাতে কত গান তুলিয়া রাখিয়াছি। আসিবার সময় আনা হয় নাই।

একটা ভিখারির কাছ হইতে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—

যাও যাও গিরি। আনিতে গৌরী
কেমন করে উমা রয়েছে—

এ নাকি আগমনী গান।

আবার আর একটি গান শুনিয়াছিলাম।

নবমী নিশিগো তুমি আর
পোহায়োনা ! তুমি চলে গেলে
আমার উমা যাবে চলে নয়নের জল শুকাবে না।

আরও কত কী যে ছিল।

সেই সব কাগজগুলির জন্য মন কেমন করে।

আচ্ছা আমি তো খুবই সুখে আছি। তবু মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এমন দুঃখ দুঃখ ভাব আসে কেন? অনেক দিন বাপের বাড়ি যাইতে না পাওয়ায়? সকলের জন্য মন কেমন করায়? তাই নিশ্চয়।

অথচ যাওয়ার কারণও আসে না।

অন্য বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়াটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় প্রায় বছরে বছরেই— বাপ মায়ের কাছে গিয়া আঁতুড় তুলিতে। সন্তান জন্মকালে বাপের বাড়ি যাওয়াই প্রথা।

আমার তো সে সুযোগ ঘটে নাই।

তবে আমি আবার এমন পাষাণী। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ একরকম ভালই হইয়াছে— তেমন অবস্থা ঘটিলে তো— স্বামীকে ছাড়িয়া দীর্ঘদিন থাকিতে হইত!

ইস। লোকে এ লেখা দেখিলে হয়তো ভাবিবে কী বেহায়া মেয়ে বাবা।

কেউ দেখিবে না, এই যা ভরসা।

কিন্তু মনের কথা তো মনের অগোচর নয়!

আঁতুড় তুলিতে তো বৌরা সাতমাস আটমাস বাপের বাড়ি কাটাইয়া আসে। আবার এ বাড়ির মেয়েরাও যখন সেই কারণে আসে, একই ব্যাপার হয়।

তবে গিন্নিবান্নি বৌদের যখন সন্তান সম্ভাবনা হয়, তাঁহারা এখানেই থাকেন দেখি। তাও তো হয়।

পুত্রবধূরা আঁতুড়ঘরে যাইতেছে শাশুড়িও যাইতেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়।

এ বাড়িতে— একটি বাঁধা ব্যবস্থায় সাজানো গোছানো আঁতুড় ঘরই আছে। আলাদা সব বিছানা কম্বল, বাসনপত্র তোলা থাকে সেই ঘরে। যাহার যখন দরকার হয়, কাজে লাগে।

তবে— আমার দেখা নয়, শোনা কথা— আমার এক খুড়শাশুড়ি নিজের মেয়ের সঙ্গে একই আঁতুড়ে ভর্তি হইয়াছিলেন।

দুইটি শিশু, অর্থাৎ মামা ভাগ্নে নাকি দুই দিনের ছোটবড়।...কে জানে আমাদের গ্রামেও এমন দৃষ্টান্ত আছে কিনা। তখন তো এসবের খোঁজ রাখিতাম না।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন কৌতুক বোধহয়।

লজ্জা শব্দটার মাথামুণ্ডুও বুঝি না।

এদিকে বৌদের বেলায় প্রতিটি ব্যাপারে হায়া লজ্জা লইয়া সমালোচনা হয়, কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে?

ইহাতে কোনও লজ্জাবোধের কারণ নাই?...

অথচ জামাই হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেই খুড়শাশুড়ি ডুরে শাড়ি বা রঙিন শাড়ি পরিতেন না। কপালে সিঁদুর টিপ ছাড়া, কাঁচপোকার বা সোনা পোকার টিপ পরিতেন না। কানে ঝোলানো মাকড়ি বা ইয়ার রিং পরিতেন না। পাতা কাটিয়া চুল বাধিতেন না।

জামাই হইয়া যাওয়া মানেই তো বয়স্কার মর্যাদা বহন করিতে হয়। তাছাড়া দৈবাৎ যদি জামাইয়ের চোখে পড়িয়া যায়, শাশুড়ি পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়াছেন এবং রঙিন শাড়ি পরিয়াছেন, তাহা হইলেই তো লজ্জার মাথা কাটা। কিন্তু এর বেলায়?

জামাই জানিতে পারিল না?

জামাইয়ের সামনে লজ্জার পরাকাষ্ঠা কী? না নিজের শিশুপুত্রটি মাতৃদুগ্ধের চাহিদায় কাঁদিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছে। তিনি তখন নাতিটিকে কোলে লইয়া আদর করিতেছেন।

ইহাকে কী বলে? কোন ধরনের লজ্জা?

খুড়শাশুড়ি গুরুজন। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। শুধু লজ্জা শব্দটার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

আর শুধু তো একা তিনিই নন। এমন তো সকল ক্ষেত্রেই।

এই ঘটনাটি আমার প্রত্যক্ষগোচরে হইয়াছিল বলিয়াই এমন চোখে ফুটিয়াছিল।

অথবা বলিতে হয়, চোখ ফুটিয়াছিল!

আসলে এই সমাজ অভিধানে লজ্জা শব্দটি কেবলমাত্র বাহিরের ব্যাপার। মনের নয়। একটি আচরণবিধি মানিয়া চলা মাত্র।

বলিব কী?

শুধুই কি মামা ভাগ্নে একই বয়সী হয় তা তো নয়। কাকা ভাইপোও তো হয় বলিয়াছি। এই তো সেদিন—

আমাদের কোনও আত্মীয়র বাড়ি হইতে একটি পৈতের নিমন্ত্রণ আসিল।

একত্রে দুইটি ছেলের পৈতে।

সকলে হাসাহাসি করিল, ওরে মানিকজোড়ের মুখে ভাত হয়েছিল একসঙ্গে, হাতেখড়ি হয়েছিল একসঙ্গে আবার পৈতেও হচ্ছে একসঙ্গে সেই একই নান্দীমুখে। তো একই দণ্ডীঘরেই থাকবে নিশ্চয়। তা হলে একই ছাঁদনা তলায় বিয়েটাও হবে না তো?

কে যেন বলিয়া উঠিল, তাহলে একই কনের সঙ্গেও দিতে হবে। দ্রৌপদীর মতন পঞ্চপতি না হলেও, দ্বিপতি।

আরও হাসির রোল উঠিল, তাহলে কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক হবে ?

এত হাসির কারণটা কী ?

পরে শুনিয়াছিলাম মানিকজোড় নামের এই কাকা ভাইপো দুটির জন্মক্ষণ নাকি একই।

একই আঁতুড়ঘর, একই ধাই।

দুজনেই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল একই সঙ্গে। এমনও হয় ? আশ্চর্য !

কিন্তু ভাবিতে বসিলে কেমন লাগে ?

অথচ পৈতে বাড়িতে গিন্নির ধরন ধারণে তো লজ্জার বালাই মাত্র দেখিলাম না। দিব্যই তো দাপটের সঙ্গে কর্তৃত্ব করিয়া বেড়াইতেছেন।

আর কর্তা।

যিনি ওই মানিক জোড়দের মধ্যে একজনের পিতা, এবং অপর জনের পিতামহ! তো তিনিও তো বীরবিক্রমে হাঁকডাক করিয়া উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন দেখিলাম।

যাহাতে শাস্ত্রীয় কর্মে কোনও ত্রুটি না হয়, এবং অভ্যাগত আপ্যায়ণে ত্রুটি না হয়, তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য !…কুণ্ঠার লেশও নাই।

আমি যেন অবাক হইতে হইতে বাক্যহারা হইয়া গিয়াছিলাম।

তা এমন নেহাতই একই ক্ষণে জন্মানোর ব্যাপার না হইলেও এমন ঘটনা তো বিরল নয়।

লজ্জা শব্দটির তবে অর্থ কী ?

এদিকে বাড়ির তরুণ ছেলেদের ক্ষেত্রে ?

সেই ছেলেরা যখন প্রথম সন্তানের জনক হয় ?

সে যেন লজ্জার দায়ে চোর দায়ে ধরা পড়িয়া থাকে।

বেচারি সেই দায়ে আপন শিশুটিকে একবার কোলে করা তো দূরস্থান, তাহার দিকে তাকাইতেও লজ্জা পায়। বলিতে কী—

সকলে মিলিয়া লজ্জা পাওয়াইয়া ছাড়ে। কারণ কোনও এক সময় শিশুটি কাঁদিতেছে দেখিয়াই হয়তো সে একবার তাহাকে দোলনা থেকে উঠাইয়াছে, এমন দৃশ্য দেখিতে পাইলেই, কোথা হইতে যে তৎক্ষণাৎ বাড়ির রমণীকুল আসিয়া জুটিয়া হাস্যরোল তুলিবেন, ওরে, দেখে যা সবাই। অমুক বাবাগিরি করতে এসেছে! · ছেলের কান্না ভোলাতে বসেছে।

কীরে ? ছেলে বাবা বাবা বলে ডাকছিল না কি ?

এমনি সব আলতু ফালতু কথা।

বাবা বেচারি ত তদ্দণ্ডে ছেলে নামাইয়া রাখিয়া চম্পট দিতে পথ পায় না।

নতুন মা হওয়া বালিকা বধূটিকে তো সারাক্ষণই শিশুকে কোলে বহিয়া

হিমসিম খাইতে হয়, কান্না সামলাইতে হয়।

দৈবাৎ একবার ছেলের কান্না শুনিতে পাইলেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে অভিভাবককুল ছুটিয়া আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িবেন, ছেলে কাঁদে কেন? ছেলে কাঁদে কেন?···চুপ করাও। দুধ দাও। ইত্যাদি রবে!

নতুন বাবাটির বেলাতেই এমন কেন?

যেন প্রথম বাবা হওয়া ছেলের শিশুর প্রতি একটু টান রীতিমত হাসির খোরাক।

কাজেই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বেচারি সন্তানকে একটু স্পর্শ করিতেও আগাইয়া আসিতে পারে না। তাহার মুখটি দেখিতে পায় কেবলমাত্র রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়।

তাও একটু আদর করিতে সাধ জাগিলেও ভয়, যদি জাগিয়া ওঠে? জাগিলেই তো শিশুর নিজস্ব ধর্মে কান্না জুড়িবে।

তাহা হইলেই তো গুরুজনরা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ ঘুমে জলাঞ্জলি দিয়া, ছুটিয়া আসিয়া পুত্র পুত্রবধূর শয়ন ঘরের নিভৃত ক্ষেত্রেই হানা দিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিবেন। শিশু কাঁদে কেন? যেন কান্নাটা শিশুর পক্ষে আশ্চর্যজনক। নিশ্চয় তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, অথবা পেট ব্যথা করিতেছে।

আমার তো মনেই··· এ যেন লোক দেখানো আতিশয্য।··· অথবা শিশুটির মা বাপের ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের পরিচয়।

যেন— দামি মাছ তরকারি আনাজ ইত্যাদি কোনও আনাড়ি রাঁধুনির হাতে পড়িয়াছে। পাকা রাঁধুনিদের অস্বস্তি, আকুলতা!

কিম্বা কোনও অবোধ বালিকার হাতে ভাল পুতুল খেলনা পড়িয়াছে। ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া বসিবে। ভাবিয়া আগলাইয়া বেড়ানো।

মাঝে মাঝে মনে হয় ওই নবজাতকের পিতামাতার মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মানোই যেন অভিভাবকদের অভিপ্রেত নয়। তাহাতেই তো নিজেদের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাইবে। উহারা আর বড়দের হাতের মুঠায় থাকিবে না। মুখাপেক্ষী হইবে না। অসহায়ভাব দূর হইয়া যাইবে। কেন যে এমন সব মনে হয় আমার! অথচ কেবলই এমন সব নানা কারণ মনে আসে।

একি আমারই মনের ভ্রম?

আমার মনটা কি কিছু কুটিল?

সে কথা ভাবিলেও তো দুঃখ আসে।

আসলে— আমাদের সামাজিক এবং সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনে, আচার আচরণ পদ্ধতির মধ্যে যে কত হাস্যকর বিসদৃশ ব্যাপার চালু আছে। যাহা অর্থহীন ও অহেতুক বিড়ম্বনাদায়ক, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখে না।

যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই চলুক। এমনি এক চিন্তাহীন ভাব,

লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলা হয়।

কিন্তু আমারই বা এত চিন্তা আসে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে খেই হারাইয়া যায়।

বাড়িতে আমার প্রায় সমবয়সিনী আরও অনেক মেয়েই তো আছে। জা ননদ ভাগ্নি, ভাসুরঝি প্রভৃতি। কই তাহাদের কারও মধ্যে তো এই বিসদৃশ ব্যাপার লইয়া কৌতুক বোধ নাই। অথবা দুঃখবোধ।

কখনও কাহারও সহিত এসব চিন্তা লইয়া প্রশ্ন তুলিলে তাহারা হাসিয়া খুন হয়।

বলে, এ বৌটার মাথায় ছিট আছে। স্রেফ মগজে গণ্ডগোল।

আমার তো উহাদেরই মগজবিহীন বলিয়া মনে হয়। অথচ ওরা আমার মগজে গণ্ডগোল দেখে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, একবার পিতামহর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা ঠাকুরদা এমন কেন মনে হয় আমার? ওরাই ঠিক? আমিই বেঠিক?

জ্ঞানাবধি তিনিই তো আমার সকল প্রশ্নের উত্তরদাতা।

অবোধ শিশুচিত্তে যখন প্রশ্ন করিয়াছি, আচ্ছা ঠাকুরদা, জবাফুলে কেন তোমার ঠাকুর ঘরের নারায়ণ ঠাকুরের পুজো হয় না আর কালী ঠাকুরের জন্যে জবাফুলই দরকার? দুজনেই তো ঠাকুর। আচ্ছা পৃথিবীতে এত গাছ। কিন্তু শুধু মাত্তর বেলপাতা, তুলসীপাতা আর আমপাতা ছাড়া আর কোনও পাতা পুজোর কাজে লাগে না কেন?···ঠাকুরদা, মেয়েদের কেন বিয়ে হলেই শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়। আর নিজের বাড়ির লোক থাকে না সে? ছেলেদের তো তা কই তেমন হয় না? ছেলেদের তো আবার দেখি শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই লজ্জা। জামাইকে কুটুম বলা হয়, কই বৌদের তো তা বলা হয় না। সেও তো অন্য বাড়ির মেয়ে। মেজদির বিবাহের পর এ প্রশ্নটি বড় বেশি মনে জাগিত!

পিতামহ কখনই এই আবোল তাবোল প্রশ্নে বিরক্ত হইতেন না। কখনও হয়তো হাসিয়া উঠিয়া বলিতেন, কেন হয় বড় হলে বুঝবি।

কখনও খুব নরম ভাবে কিছু একটা বুঝাইয়া দিতেন।

সেখানেও অনেকে আমায় পাগল ছাগল বলিত। ঠাকুরমাই তো বলিতেন। অবশ্য আদর করিয়া।

কিন্তু আমার স্বামী?

না না কখনও নয়।

তবে তাঁহাকে তো আমার বর্তমান চিন্তাগুলির কথা বলিতে পারি না।

কিন্তু আমার চিরদিনের উত্তরদাতার কাছে গিয়া বসিবার সুযোগ কি

আর ঘটিল ?

নাঃ ! এ জীবনে আর সে ভাগ্য হইল না। হইবেও না।

গিয়া বসিলাম— তাঁহার মৃতদেহের পায়ের কাছে।

এটুকুই কি ভাগ্যে জুটিত, যদি আমার পরম স্নেহময়, পরম করুণাময় প্রেমময় স্বামী আমার সহায়তায় আগাইয়া না আসিতেন ?

রাংচিতা হইতে যখন ওখানকারই একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার প্রতিবেশী বাহিত হইয়া খবরটি আসিল, সেইদিনই ভোর সকালে পিতামহ সহসা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সেই প্রতিবেশীকে আমি আগেও দেখিয়াছি। বাবা তাঁহাকে গুপিদা বলেন। আমি গুপি জ্যেঠু !

অথচ তিনি খবরটা বৈঠকখানা ঘরে পুরুষদিগের কাছে জানাইয়া চলিয়া গেলেন। আমার সহিত দেখা না করিয়া ! বলিয়া গেলেন নাকি তাড়া আছে !

কেন এমন করিলেন ? আমি পাছে কান্নাকাটি করি বলিয়া ?

তিনি আসিয়াছেন, একথাও আমাকে তখন কেহ বলে নাই। কিন্তু আমি যেন অন্তর হইতে কী একটা বুঝিলাম। হঠাৎ যখন আমার শ্বশুর মহাশয় অন্দরে আসিয়া কাহাকে যেন প্রশ্ন করিলেন রাঙা বৌমার সকালের জলখাবার খাওয়া হয়েছে ?

তখনই আমার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল।

একথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন হঠাৎ ? তাও একজন খুড়শাশুড়িকে উদ্দেশ করিয়া। কারণ আমার দুর্ভাগ্য বড়দি তখন ছিলেন না। তাঁহার গুরু আশ্রমে উৎসব বলিয়া খড়দায় না কোথায় যেন গিয়াছিলেন তার দুইদিন আগে হইতে।

তাহার পর শুনিতে পাইলাম, আচ্ছা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। পরে তাঁকে ডেকে দিও। একটা খবর আছে।

খবর আছে। কী সেই খবর ?

কী আর ?

সেই মোক্ষম খবর। তবে খুবই ধীরে ধীরে সহানুভূতির সঙ্গেই খবরটি আমায় জানানো হইয়াছিল। এরা নির্মায়িক নয়। অন্ততঃ পুরুষরা নয়।

আমি কি কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম ?

কই মনে পড়িতেছে না।

প্রথমটা বোধহয় অবিশ্বাসে পাথর হইয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া দেখিয়া-ছিলাম। তখন নাকি আমার মাথার ঘোমটা পিঠে নামিয়া পড়িয়াছিল।

তারপর ?

আমি নাকি শ্বশুরমহাশয়ের উপস্থিতিতেই হঠাৎ, কই ? কোথায় ?

গর্পিজ্যাঠা ? আমি তাঁর সঙ্গে যাব—

বলিয়া বৈঠকখানার দিকে ছর্টিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আর গর্পিজ্যাঠা চলিয়া গিয়াছেন শর্নিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলাম, আমি যাব ! আমি যাব।

আমার নিজের এসব কথা মনে নাই। তখন কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে আবৃত ছিলাম।

পরে অন্যান্য মেয়েদের মর্খে শর্নিয়াছিলাম সক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং ধিক্কার সহযোগে।

বর্ড়ো থর্ড়থর্ড়ে ঠাকুরদার মারা যাওয়ার খবরে এমন ? নাটকের নায়িকা নাকি ?

আর যখন আমাকে প্রবোধ দিতে গর্র্জনেরা বলিয়াছিলেন, এখন আর গিয়ে কী হবে বাছা ? গিয়ে তো আর দেহটর্কুও দেখতে পাবে না। পরে বরং শ্রাদ্ধ-শান্তির সময় যেও যদি তোমার বাবা জ্যাঠারা যাবার কথা বলেন।

তখন নাকি আমার স্বামী বেহায়ার মতো বলিয়াছিলেন, পরের কথা পরে। এখন এত কাতর হচ্ছে ! যাক না হয় একটিবার। কতটর্কুই বা পথ ? শ্যালদা থেকে খানিকটা তো রেলের রাস্তা পাওয়া যায়—। এখনই বেরোতে পারলে বেলা বারোটা নাগাদ পেঁছে যাওয়া যাবে। তার আগে কি আর দাহ হয়ে যাবে ? আজ ভোরেই তো গেছেন শর্নলাম !

সব কথাই পরে শর্নিয়াছিলাম ওই ব্যঙ্গচ্ছলে।

ওই সব ছোট ছেলেটা যে কী পরিমাণ বৌ পাগলা বৌ অন্ত প্রাণ তাহা বর্ঝাইতেই নানা মন্তব্য।

শ্বশর্র মহাশয় হাইকোর্টের উকিল, বিবেচক মানর্ষ, ছেলের বক্তব্যকে নাকচ করিয়া দেন নাই। তখন বলিয়াছিলেন তাহলে না হয় সরকারমশাই আর বিন্দর্কে সঙ্গে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দে।

বিন্দর্ পর্রনো দাসী। মেয়েরা যখনই নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন বাবদ কোথাও যায় সে সঙ্গে যায়। সরকারমশাইও খর্বই পর্রনো লোক। তবর্ পর্র্ষ তো ? একা তাহার সহিত যাওয়াটা নাকি সম্ভ্রমজনক নয়।

কিন্তু আমার স্বামী তখন বলিয়া বসিলেন অত কাজ কী ? তিনিই পেঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। একদিন কোর্ট কামাই করিলে এমন কিছর্ ক্ষতি নাই।

এমন বৌ অন্তপ্রাণ ছেলেকে আর কে কী বলিবে ?

আড়ালে হাসাহাসি আর ঈর্ষা করা ছাড়া করিবার কিছর্ নাই।



॥ ৭ ॥

যখন পৌঁছাইলাম, তখন মরদেহ উঠাইবার তোড়জোড় চলিতেছে। গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া ভাঙিয়া পড়ায় আর পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন বলিয়া হাহাকার করায় বিলম্ব হইতেছিল।

সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বেই যাহাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত সেই সময় মৃত্যু হওয়ায়—প্রশ্ন উঠিয়াছিল নাকি দিন থাকিতেই দাহ হইবে। না দিনান্তের পর?

কিন্তু বিধান দিবে কে?

সকলের সকল কাজে বিধানদাতাই যখন স্বয়ং নিরুত্তর নিশ্চুপ।

তবু পিতামহরই এক বিশেষ প্রিয় ছাত্রকে ডাকা হইয়াছিল। তিনিই বলিয়াছিলেন, দিনান্তের পূর্বেই।

এইসব বিধিবিধানের কচকচির শেষে আর চালি তৈয়ারির পর শেষ ক্ষণেই পৌঁছাইলাম। পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম।

তখন নাকি বলিয়া উঠিয়াছিলাম ঠাকুরদা তুমি এত নিষ্ঠুর!

এও, আমার অপরের মুখেই শোনা।

ঠাকুরদার সেই নিথর পাথর মুখটির প্রতি চাহিবামাত্রই বোধহয় প্রাণের

মধ্য হইতে কথাটি উচ্চারিত হইয়াছিল।

ওই কথা বলিয়াছিলাম শুনিবার পর মনে হইয়াছিল, আমিই বা কী কম নিষ্ঠুর? এই এতটুকু সময়ের পথ, একবারের জন্য আসিতে পারিতাম না আমি? এই আট বছরের মধ্যে?

নাঃ। আট বছরের মধ্যে কলিকাতা হইতে মাত্র আঠারো ক্রোশ দূরে রাংচিতা গ্রামে আসা হইয়া ওঠে নাই।

কারণ?

কারণ আসিবার উপযুক্ত তেমন কোনও কারণ ঘটে নাই।

ভাইপো বিশুর পৈতার সময় ইহারা একটি পত্র দিয়াছিলেন, যদি আমার শ্বশুরবাড়ি হইতে আমাকে পাঠানোর মত হয় তবে তাহারা লোক পাঠাইয়া লইয়া যাবার ব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু সেই পত্র তেমন গ্রাহ্য হয় নাই। কারণ তখন বাড়িতে বড় ভাসুরের একটি মেয়ের বিবাহ আসন্ন। মেয়ে ওঁর অনেকগুলি।

তবে আসন্ন হইলেও সেইদিনই তো নয়? আমি যদি আমার স্বামীর কাছে তেমন ব্যাকুলতা জানাইতাম? কতদিন ঠাকুরদাকে দেখি নাই বলিয়া কাতর হইতাম? তিনি নিশ্চয় ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বাড়ির কাহাকেই বা দেখিয়াছি?

আমার মেজজ্যাঠা ও সেজজ্যাঠার মাঝে মধ্যে কলিকাতায় কিছু কাজ পড়ে। তাঁহারা দুই একবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন।

বাবা নয়।

কারণ দৌহিত্র সন্তান না হইলে তো, জামাইবাড়ি জলগ্রহণ চলে না!

মাঝে মধ্যে চিঠির আদান-প্রদানই ছিল শান্তি আর সান্ত্বনা।

তাও তো পোস্টকার্ড মারফৎ। বাবার সেই নিষেধ এখনও মানিয়া চলি। কদাচ কখনও এনভেলাপে চিঠি লিখি। তাও তাহার মধ্যে জনে জনে আলাদা থাকে বলিয়াই।

হয়তো বিজয়া দশমীর পর কি অনেক দিন পত্র না পাওয়ায়।

রাংচিতার কথা মনে পড়িলেই প্রাণ মন অস্থির হইয়া উঠিত বটে, আবার এই পরিবারের জীবনের স্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনখানি মিশাইয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি।

এমন বৃহৎ পরিবারের একটি গুণ (বা দোষ) কেউই কোন সময় নিজেকে লইয়া বেশিক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না।

হাতে কাজ করিতে করিতেই মুখে কথার চাষ চালাইতে হয়।

তাছাড়া—সর্বদা গুরুজন হইতে লঘুজন পর্যন্ত সকলের মনোরঞ্জনের সাধনা থাকে না?

আর সর্বোপরি?

যখনই তাঁহাকে দেখি? তাঁহার সঙ্গ পাই?

তখন কি বিশ্বসংসারে আর কিছু আছে তা মনে থাকে?

এখন রাংচিতায় আসিয়া অবাক হইতেছি এতদিন এইসব দৃশ্য না দেখিয়া স্থির থাকিয়া ছিলাম কীরূপে?

আশ্চর্যও হইতেছি।

সেই গাছগুলি যেখানে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। তুলসি মঞ্চের নিচের প্রদীপ জ্বালাইবার ছোট্ট বেদিটি অবিকল তেমনি আছে।

আমার ছেলেবেলায় মজা করিয়া একদিন যে আমের আঁটিটি পুঁতিয়াছিলাম চারা গজাইয়া সেটি দিব্য বড় গাছ হইয়া উঠিয়াছে।

কালী মন্দিরের চাতালে উঠিবার সিঁড়িগুলির যে কোন্‌গুলি যেমন ভাঙা ছিল, ঠিক তেমনই আছে!

পিস ঠাকুমা আমাকে দেখামাত্রই আকাশ ফাটানো চিৎকারে কাঁদিয়া উঠিলেন। কত কী কথা কহিলেন, তাহার পর হঠাৎ গলা ঝাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, তোরা কেউ নাতজামাইকে সঙ্গে করে ভটচার্যি বাড়িতে নিয়ে যা একবার। একটা ডাব খাইয়ে আন। তেতে পুড়ে এসেছে। এখন তো এ বাড়িতে জল মুখে দেওয়া চলবে না।

আশ্চর্য! এত শোকের সময়ও এসব মনে পড়ে?

স্বামী দৃঢ় আপত্তি জানালেন।

জামাইয়ের মহানুভবতায় মা তো আহ্লাদে আবেগে কাঁদিয়াই ফেলিলেন।

নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, একি ভাবা যায়? মেয়েটা তাঁহার এত সৌভাগ্যবতী!

বাবা জ্যাঠামশাইরাও তো যেন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। · আমি সৌভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু এতটা ভাল লাগিল না। এযেন কত কৃতার্থভাব। আমার দুষ্ট মন, অত দুঃখের সময়ও হঠাৎ ভাবিয়া বসিলাম, আচ্ছা, একি কেবলমাত্র জামাই বলিয়াই। কথাতেই তো আছে জামাতা না দেবতা।

তবু ভাবিলাম তাছাড়াও উহারা বড়লোক বলিয়াই কি?

নাঃ। সে চিন্তা মনে শিকড় গাড়িতে পাইল না। আমার স্বামী বিদায় লওয়ার পরই বড়দি বড়জামাইবাবু ছেলেমেয়ে সহ আসিয়া পড়িলেন সন্দেশখালি হইতে। তখনও মা ওইরকম কৃতার্থ ভাব দেখাইলেন। দুঃসংবাদটি পাওয়া মাত্রই তোড়জোড় করিয়া এতজনকে লইয়া চলিয়া আসার মহিমায়।

আমার অবশ্য মনে হইল, এতজন আসিয়া কি কিছু সুবিধা করিলেন? না অসুবিধা বাড়াইলেন?

ছেলেমেয়ের সংখ্যা তো কম নয় বড়দির।

আশ্চর্য! ঠাকুরদার মৃত্যু হইল, অথচ মেয়েদের কোনও অশৌচ লাগিল না। এমনকি পিস ঠাকুমা? আজীবন দাদাই যাঁহার একাধারে মা বাপ গুরু ইষ্ট সন্তান। সেই পিস ঠাকুমারও কিছুই না।

তিনি শবযাত্রার পরই গোবরছড়া দিয়া স্নানশুদ্ধ হইয়া ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিতে গেলেন। বাড়ির নেহাত কুচোকাচা এবং বড়দির সংসারটির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় তৎপর হইলেন।

আবার শববাহীরা ফিরিয়া আসিবার পর মুখে দিবে বলিয়া মিছরির পানা তৈরি করিয়া রাখিয়া— দরজায় আগুন নিমপাতা ও শুকনো মটর ডাল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া অতঃপর মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন!

বড়জামাইবাবুকে আমি দুচোখে দেখিতে পারি না। একেই তো এখনও জামাইগিরির কমতি নাই। তাহার উপর আবার সকল ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা, এবং কেমন একটা হামবাড়া ভাব।

বড়দির সঙ্গেও আমার বয়েসের দূরত্ব ঢের। মেজদির মতো তেমন আপন মনে হয় না।…তাছাড়া কেমন যেন স্বার্থপর স্বার্থপর লাগিতেছে। এই অশৌচের বাড়িতে সর্বদা কেবল নিজের স্বামী সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া ভাল হইতেছে কিনা, তাহার তদারকি করিয়া বেড়াইতেছেন।

আর কেবলই সকলের খুঁত কাটিয়া বেড়াইতেছেন।

অবাক লাগিতেছে অথচ আমরা দুইজন সহোদর বোন!

মেজদি আসিতে পারে নাই। এখন— আঁতুড়ে। …বোধহয় চতুর্থবারের ঘটনা।

আমার যে এখনও একবারও ওই পরম স্থানটিতে যাইবার সৌভাগ্য ঘটে নাই, এই লইয়া ঘরে পরে সকলে হায় হায় করিতেছেন। যেন আমি একটা ভিখারিণী তুল্য।

শুনিয়া শুনিয়া রাগ আসিতেছে।

এত কী?

কই আমার তো এমন মনে হয় না।

ঠাকুরদাবিহীন রাংচিতা আর ভাল লাগিতেছে না।

ঠাকুরমার দিকেও তাকাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। বিধবার বেশে ঠাকুমা যেন অন্য একজন হইয়া গিয়াছে।

জন্মাবধি দেখিয়াছি, টাকজোড়া সিঁদুর, পায়ে আলতা। ব্রাহ্মণ গিন্নি এবং পণ্ডিত গৃহিণী বলিয়া, অবিরত অন্য বাড়ি হইতে মেয়েরা আসিয়া সিঁদুরের উপর সিঁদুর চাপাইত। আলতার উপর আলতা চাপাইত।

আর লালপাড় শাড়ি ব্যতীত কদাচ না।

নানা উপলক্ষে এত পাওনা হয় যে, ইচ্ছামতো পাড়ের একখানা কিনিয়া পরিয়া সাধ মিটাইবার অবকাশই ঘটে না।

সেই ঠাকুমা সাদা থান জড়াইয়া বসিয়া আছেন!

রাংচিতা আর ভাল লাগিতেছে না!

স্বামী ফিরিয়া যাওয়ার সময় বাবা তাঁহার হাতে ধরিয়া অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে আমি পিতামহের শ্রাদ্ধকার্য শেষে নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত থাকি! তাঁহার হাতে আমার জ্যাঠ শ্বশুর মহাশয়কেও একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহার সহিত আমার শ্বশুর মহাশয়কেও।

সেই একই কথা।

মেয়েকে এই কদিন এখানে রাখিতে অনুনয় বিনয়।

পরে বলিয়াছিলাম, তোমরা এমন করছ— যেন আমি এই কদিন থেকে তোমাদের মাথা কিনব!

বড়দি শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল ওলো। মাথা কিনবি রে কিনবি। বড়মানুষের পরিবার বলে কথা! এ কি আমার মতন— হাভাতের পরিবার? যে এসো লক্ষ্মী যাও বালাই!

বড়দির কথাবার্তা যেন কেমন।

হঠাৎ হঠাৎ বড্ড যেন অমার্জিত লাগে ওকে। আর মনে হয়, ভাগ্যিস আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। দেখিলে কী ভাবিতেন কে জানে।



॥ ৮ ॥

ঠাকুরদার ঘাট কামানোর দুদিন আগে আর একটি ঘটনা ঘটিল। যেটি আমার জানা ছিল না। ধারণাও নয়।

মনোহরপুকুরের বাড়ির সরকার মশাই বিন্দুদাসীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিলেন, রাশিকৃত জিনিস লইয়া। এটি নাকি নিয়ম। কেন আর কিসের নিয়ম?

কি জিনিস? এ বাড়ির সকলের জন্য নতুন ধুতি চাদর শাড়ি এবং ঝোড়া ভর্তি ফল আর হবিষ্যান্নে প্রয়োজন এমন সব বস্তু! যাবতীয়। সবই প্রচুর পরিমাণে।

কাপড় সবই লালপাড়। ধুতিও লাল নরুন পাড়।

এমনকি বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সকলের নাম ও বয়স জানা নাই বলিয়া আন্দাজি নানা মাপের ধুতি শাড়ি আনিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। পাঁচহাতি হইতে নহাতি পর্যন্ত।

ঘাট কামানোর পর স্নান সারিয়া যে নতুন বস্ত্র পরিতে হয় সে বস্ত্র নাকি বৈবাহিক সূত্রে কুটুম বাড়ি হইতে আসিতে হয়। এও লৌকিকতা। ঠাকুরমার

জন্য থান ধুতি। আহা! দেখিয়া প্রাণ কাঁদিল। এইসবের সঙ্গে নিয়ম ভঙ্গের দিনে মাছ খাওয়ার জন্য নগদ দুইশত টাকা।

দুইশত টাকার মাছ। আসলে সবই লৌকিকতা বাবদ।

দেখিয়া বাড়ির সকলের চোখ কপালে উঠিয়া যাইবার দাখিল।

এতো কেন? এত এত তো কই কেহ দেয় না? এ যে অতিরিক্ত।

আসলে— যাঁহারা পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভ্যাস অনুযায়ী মাপকাঠিতে পাঠাইয়াছেন, আর যাঁহারা পাইলেন তাঁহারা— বিচার করিয়া তাঁহাদের অভ্যাস অনুযায়ী মাপকাঠিতে মাপিয়া ভাবিলেন অতিরিক্ত।

আমি বেচারি এই অ-সম মাপকাঠির মধ্যবর্তী একটি অসহায় প্রাণী। আমার এই সময় হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল পিতামহর শবদেহ বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য, যে বাঁশের চালি বানানো হইতেছিল সেই বস্তুটিকে দেখিয়া আমার স্বামী যেমন অবাক দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন, তেমনি অবাক দৃষ্টিতে আমি তাকাইয়াছিলাম। একদা আমাদের চক্রবেড়িয়ার জ্ঞাতি বাড়ির এক সধবা দিদিশাশুড়ির মৃত্যুতে তাঁহাকে পালিশ করা পালঙ্কে শোয়াইয়া বহিয়া নিয়া যাওয়া দেখিয়া। পালঙ্কের বাজুতে বেশ কারুকার্য করা।

এই জিনিসটিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া পুড়াইয়া দিবে।

ভাবিয়া আমি হাঁ হইয়া গিয়াছিলাম।

পোড়ায় না ফেলিয়া দেয়, আহা আমার জানা ছিল না। তবে পালঙ্কে চড়িয়া শ্মশানে যাওয়া আমার জ্ঞানে ইতিপূর্বে দেখি নাই।

স্বামীও নিশ্চয় চালি বানানো দেখেন নাই।

তাহার অর্থ এই আমাদের দুইজনকেই প্রতি পদে মনে মনে হোঁচট খাইয়া চলিতে চলিতে জীবন যাপন করিতে হইতেছে।

তবে স্বামীকে সর্বদা নহে। আমাকে সর্বদা।

আমি এদের এত বাহুল্য খরচ, এত অপচয়, এত অহেতুক বিলাসিতা দেখিয়া দেখিয়া কেবলই হতবাক হই! তবে কখনও সেই ভাবটি প্রকাশ করিয়া বসিয়া খেলো হই না এই যা। অবশ্য নিজে কিছু অপচয় বা অতিরিক্ত খরচের দিকে যাই না।

এ অভ্যাস হয়তো আমার সহজাত, অথবা শ্বশুরবাড়ি আসিবার পূর্বে আমার মা একটি বাক্যে আমায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহারই ফল।

মা বলিয়াছিলেন, পরের ঘরে যাচ্ছ মা, একটি কথা মনে রেখো, বোবার শত্রু নেই! আর কোনও সময়ই আমার শব্দটি মুখে এনো না। আর স্বামীর কাছে কিছু চেও না। নেহাত দৈবাৎ কিছুর দরকার হলে গিন্নিদের কাছে জানিও।

তা দরকার আর কী এমন হয়? এদের সংসারে সবই তো দরকারের বেশি

মাপেই থাকে। তবে দৈবাৎ যেমন এই খাতাখানির বেলায়। সে তো গিন্নিদের কাছে বলবার নয়।

এ বাড়ির নিয়মে—মাসে মাসে বৌদের হাতে পাঁচ দশ পনেরো কুড়ি মতো টাকা হাত খরচ বলিয়া দেওয়া হয়। যার যেমন প্রয়োজন হয়তো সেই অনুপাতে, কিম্বা বয়স হিসাবে। আমার হাতে যে পাঁচটি টাকা আসে, সেটিই তো আমার অনেক মনে হয়। আমি তো উলের গোলা বা লেশবোনার সুতা কি কার্পেটে ফুল তুলিবার কার্পেট কিনিতে চাই না।

বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের লবনচুষ কি পাঙখাবরফ খাওয়ানোর আমোদই আমার পরম আমোদ।

পাঙখাবরফ জিনিসটি সত্যি ভারি মজার। প্রথম দেখিয়া কী চমৎকার যে লাগিয়াছিল। একটুকরা কাঁচা বরফকে একটু ন্যাকড়ায় মুড়িয়া ছোট্ট হাতুড়ি ঠুকিয়া গোলমাপের একটি জিনিস বানানো। উচিত মতো জায়গায় একটি কাঠি রাখিয়া দেওয়ার কৌশলে দিব্য একখানি চেহারা।

কলিকাতা সত্যই একটি আশ্চর্য আজব দেশ!

তবে এই আট বছরে ক্রমেই সমস্ত রপ্ত হইয়া যাইতেছে। আর কোনও কিছুতেই তেমন আশ্চর্য হই না।

অবশ্য এখনও কলের গান আমার কাছে আশ্চর্যই আছে। কিছুদিন পূর্বে কেনা হইয়াছে।

হায়। ঠাকুরদার কাছে কোনও গল্পই করা হইল না।

এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়িয়াছে, মনে হয় এসব গল্প সকলের কাছে না করাই ভাল। এমন কি আমার বাল্যবন্ধুদের কাছেও। যাহারা এখনও এই গ্রামেই আছে, তাহারা তো দেখা করিতে আসিতেছে। অনেক চেষ্টা যত্নে আসা। কেউ কেউ তো বাড়ির বৌ। হইলেও পাড়ার মেয়ে।

এ বাড়ির শোকের চাইতে, আমার আসাটাই যেন বড় ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। কলকাতার গল্প শুনিতে চায় সবাই। ভাবি কত বলিব; আর সবকিছু লইয়া গল্প করিতে গেলে হয়তো ভাবিবে জাঁক ফলাইতেছি।

সুখও বুঝি অনেক ক্ষেত্রে কাঁটা হইয়া ওঠে।...সহজ জীবনের সরলতা কাড়িয়া লয়।...রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে শেখায়।

এই এখানের হাসি নামের সেই আলাভোলা মেয়েটা। যে নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন কাটাইত! তাহার সেই পূর্বজীবনের সঙ্গে এখনকার জীবনের তফাতটিই যেন একটি প্রাচীর গাঁথিয়া বসিয়াছে। একটা আড়াল বানাইয়া দিয়াছে।

রাংচিতা গ্রাম আর কলিকাতা শহরের মধ্যে কি কেবলমাত্র আঠারো ক্রোশের দূরত্ব?



॥ ৯ ॥

সরকার মহাশয়কে ও বিন্দুদাসীকে এমন সম্মান ও আদর যত্ন করা হইল যে, দেখিয়া মনে হইল ওরাই বুঝিবা এদের আসল কুটুম্ব।

আমার লজ্জা করিতেছিল।

এটা কি শুধুই সৌজন্য ? না মনের দৈন্য দারিদ্র্যের প্রকাশ ? টাকাতেই কি উঁচুনীচু ভেদ ? নাকি গ্রাম আর শহরের মধ্যেই উঁচু নীচু ভাব গড়িয়া ওঠে ?

এইসব প্রশ্নের জ্বালাতেই আমি মরি।

নিজের মধ্যেই অবিরত প্রশ্ন। কেন কে জানে। সকল বিষয়েই প্রশ্ন।

কিন্তু সকলেই কি সমান ?

জ্যাঠামশাইরা ও মা এবং বাড়ির অন্য সকলে যেমন নিজেদের নীচু ভাবিতেছেন, বাবা তো কই তেমন না। বাবার মধ্যে কেবলমাত্র সৌজন্যের প্রকাশই দেখিলাম।

সত্যি বলিতে কী যে ধরনের সৌজন্যবোধ আমার শ্বশুরমহাশয়ের মধ্যে দেখি। সরকার মহাশয়ের হাতে তিনি তাঁর বৈবাহিক দিগের (অর্থাৎ বাবা ও জ্যাঠামশাইদিগের) উদ্দেশে একটি পত্রে বিনীত নিবেদনে জানাইতেছেন, ইহাদের পিতৃদায়ের সময় উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি বিশেষ লজ্জিত ও

দুঃখিত। অনিবার্য কারণেই এই অমার্জনীয় অপরাধ। তবে বৈবাহিকরা যেন নিজ উদারতায় এই ত্রুটি মার্জনা করিয়া লন। এবং বধূমাতাকে নিয়ম ভঙ্গের পরদিন একটু প্রস্তুত করিয়া রাখেন। কেহ গিয়া লইয়া আসিবে।

পাঠাইয়া দিবেন নয়, কেহ গিয়া লইয়া আসিবে।

এর চাইতে ভদ্রতা সৌজন্য আর কী থাকিতে পারে? তাঁহারা তো বর পক্ষ।

সকলে যখন উহাদের সুখ্যাতি ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সত্য বলিতে একটু গর্ব বোধ করিলাম। যেন তাঁহারাই আমার নিজজন। আর এখানের এঁরাই কুটুম!

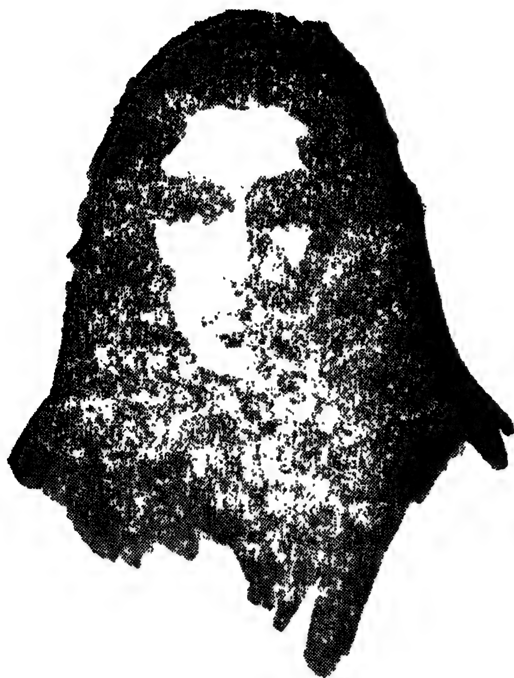
মনের কী আশ্চর্য পরিবর্তন!

বড়দি জামাইবাবু কেবলই বিরক্ত ভাবে নাক তুলিয়া বলিতেছিলেন, নজর উঁচু। নজর উঁচু। আরে বাবা পয়সা থাকলে সবাই অমন নজর উঁচু হতে পারে। ভঙ্গরতা! সভ্যতা! সৌজন্যবোধ! ওসব লোক দেখানো মহত্ব। এই আমি ব্যাটা? আসিনি শ্বশুরের পিতৃদায়ে পরিবারকে ঘাড়ে করে?…আবার নিয়েও যাব না? কেউ পেঁাছোতে যাবে? বলি কেউ তো তাতে কিছু মহত্ব দেখছে না? এখন এঁদের দায় উদ্ধারটি হওয়া পর্যন্ত থেকেই, মানে মানে চলে যেতে পারলে বাঁচি। তাই কি আর হয়ে উঠবে? আমার মা ন্যাওটা পরিবারটি তখন আবার না বায়না ধরে বসেন কতদিন পরে মায়ের কাছে এলাম আর দশদিন থেকে যাই।

ঠাকুমা নাতজামাইয়ের মান বজায় রাখিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন, তা যদি সে বায়না করে বসে ভাই, আশ্চর্যের কিছু নেই, সত্যিই তো কতদিন পরে এসেছে। তাও কদিন গোলেমালে মা ঠাকুমার সঙ্গে দুটো কথা কওয়ারও সময় হয়নি। তোমার আর কটা দিন থাকলে কি রাজকার্য বয়ে যাবে ভাই? আমিও নাতজামাইয়ের সঙ্গে দুটো গালগল্প করে বাঁচব!

আমি ঠাকুমার ওই বার্ধক্য কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। মানুষ কী বিচিত্র!

না কি সকলেই যাত্রা পালার লোকের মতন পার্ট প্লে করে? এই কদিনই তো লক্ষ্য করিতেছি—ঠাকুমা যেন ওই বড় নাত জামাইটিকে দুচক্ষের বিষ দেখিতেছেন। কেবলই আড়ালে আত্মগতভাবে বলিতেছেন, কবে যে বৌ ছেলে নিয়ে মানে মানে বিদেয় নেবেন লবাব বাহাদুর। আর এখন? ইহাকে কী বলে?



॥ ১০ ॥

তা মানুষ যে বিচিত্র, তাহা তো নিজেকে দিয়াই বুঝিতেছি।

মনোহরপুকুরে আসিয়া মনে হইল যেন বাঁচিলাম! যেন জলের মাছ ভুলিয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িয়াছিল আবার জলে আসিয়া পড়িল!

আনিতে গিয়াছিলেন আমার এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাসুরপো। তাহার নাকি ওইদিকে যাওয়া আসার অভ্যাস আছে। রাংচিতার পাশের গ্রামেই তাহার এক বন্ধুর বাড়ি। প্রাণের বন্ধু। তাই মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের পুকুরে মাছ ধরিতে বসে। আর সেই ছুতায় খুব খাওয়ায়। ভাসুরপো নাকি কে আনিতে যাইবে ভাবনা শুনিয়া নিজে থেকেই আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

আসিয়াই শুনিলাম, বড়দি নাকি এখনও ফেরেন নাই। গুরুর সঙ্গেও একরাশ গুরুভাই গুরু ভগ্নীদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।

শ্বশুরমহাশয়ের নাকি তেমন ইচ্ছা ছিল না। তবে বলিয়াছেন, চিরবঞ্চিত জীবন! যা মন চায় করুক। খারাপ কাজ তো নয়। গুরুর সঙ্গে গুরু ভাইবোনের দলে তীর্থভ্রমণ! কে কী বলতে পারবে?

অর্থাৎ শেষ কথাটি তাই।

কেউ কিছু বলিবার সুযোগ না পাইলেই হইল।

তবে বলিলেন বৈকি একজন।

তাঁহার নিজেরই পুত্র।

তবে তাঁহার কাছে নয়। রাত্রে আপন শয়নঘরের নিভৃতে বলিলেন, একান্ত বিশ্বস্ত আপন জনটির কাছে।

বলিলেন, দেখলে তো? বলিনি—বড়দি বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে। বাবা আর বারণ করবেন কী।

তাহার পর? আর দুজনের মধ্যে কী বহিরঙ্গের কথা দাঁড়ায়? কতদিনের বিরহ। প্রায় সন্ধ্যার সময় আসিয়াছি। আর অতঃপর এই গভীর রাত্রে দেখা!

(পরবর্তী কথা)

[দিব্যহাসিনীর দিনলিপির পাঁপরভাজা হয়ে যাওয়া এই খাতাখানার মাঝে মাঝেই পোকায় কাটা থাকায় খাতাটির আবিষ্কারকারিণী ফুলুকির পক্ষে সবটি সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শুধু

একান্ত অধ্যবসায়ের ফলে কিছুটা কিছুটা আন্দাজে মেরে 'ম্যানেজ' করে নিয়েছে!

তবে—দু চার জায়গায় এমন অবস্থা, যে আর আন্দাজে 'ম্যানেজ' করা সম্ভব হয়নি।

কাজেই ছেড়ে দিতে হয়েছে বেশ কিছু পাতা।

চলে আসতে হয়েছে অনেকটা দূরে—দিনলিপির লেখিকার জীবনের অনেকখানি পথ পার হয়ে!

কাজেই সেই দিব্যহাসিনী দেবীকে একটি শ্রীহীন মলিন শ্রাদ্ধ বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে দেখার পরই—দেখতে হচ্ছে একটি আলো ঝলমল বিয়ে বাড়িতে।

বিয়েটা কার?

ফুলকির তো পড়ে মনে হচ্ছে—দিব্যহাসিনীদের এই মুখুয্যে বাড়ির কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়েরা কলকাতার বাইরের কোথা থেকেও এসে পড়ে। এই বাড়ি থেকে বিয়েটা সেরে নিচ্ছেন। মনে হচ্ছে—বর বোধহয় কলকাতার। তাই এই ব্যবস্থা।]

তা সেকালে এরকম ব্যবস্থা তো ছিল একান্তই স্বাভাবিক!

কলকাতার বাইরের দূরবর্তী জায়গার বাসিন্দা কোনও জনের ডালে পালায় সম্বন্ধ সূত্রে কোনও আত্মীয় কলকাতাবাসী হলেই দরকার পড়লেই

সেখানে এসেই উঠবে।

তা সে কলকাতার ডাক্তার দেখাতেই হোক, চাকরি খুঁজতেই হোক, কি মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতেই হোক!

তাছাড়া—

যোগে যাগে গঙ্গাস্নান করতে, কি কালীঘাটে মানতি পুজো সারতে। এমনকি শখের খাতিরে—যাদুঘরে, চিড়িয়াখানা, স্টারে থিয়েটার দেখতেও।

আসবে না?

তবে আর আত্মীয় বলেছে কেন?

কন্যেদায়, মাতৃপিতৃদায় সবকিছুর থেকে বড় দায় হচ্ছে আত্মীয়দায়। সেখানে পান থেকে চুন খসলেই চোরদায়ে ধরা পড়তে হয়। আর আসছেন শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়!

আর এতো দূরস্থিত আত্মীয়ের কন্যাদায় বলে কথা। সাহায্যের হাত তো বাড়াতেই হবে।

শুধু দূরস্থিত কেন, কলকাতার মধ্যেই নিজের বাড়িতে জায়গার অভাব বলে কোনও বড়বাড়ির মালিক আত্মীয় বাড়িতে এসে মেয়ের বিয়ে উদ্ধার করাটাও তো স্বাভাবিক ঘটনা।

চট জলদি—বিয়ের জন্যে বাড়িভাড়া পাওয়া তো তখন সচরাচরের ঘটনা ছিল না। অথচ ভাল মতো বাড়ি একটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যার যেমন অবস্থা হোক বিয়েতে—দূর দূরান্তর থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে দশ-বিশদিন থেকে বিয়ের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানসূচিতে যোগ দিয়ে, অতঃপর হয়তো সুবচন সত্যনারায়ণ বরকনের জোড়ে আসা পর্যন্ত দেখে তবে বাড়ি ফিরতেন।

কাজেই যাঁরা বিয়ে দিতে বসেছেন, পাড়াপড়শিও তাঁদের সাহায্যার্থে নিজ নিজ বাড়ির দুএকখানা ঘর দালান ছেড়ে দেবেনই।

বাড়ির সংলগ্ন জমিটমি কিছু থাকলে, হোগলা ছাওয়া ম্যারাপ বাঁধতেও ছেড়ে দেবেন, শখের ফুল গাছটা তুলসী গাছটার ক্ষতিসাধন করেও!

না করলে ভাল দেখাবে কেন? মানুষ মনিষ্যত্ব বলে একটা কথা নেই?

যদিও কলকাত্তাই বলে একটা ব্যঙ্গসূচক অপবাদ ছিল। যারা আত্ম-কেন্দ্রিক তারা পরকে নিয়ে বেশি মাখামাখি করতে ভালবাসে না—ইত্যাদি বলা হলেও—ছিলও এসব। অন্তত দিব্যহাসিনী দেবীর আমলে। তার প্রমাণ এই দিনলিপি। নেহাত গেরস্থরাও এমন কর্তব্য পালন করত।

আর লক্ষ্মীমন্ত ঘরেরা?

তাঁরা তো এমন উদারতা দেখাবেনই। তাঁদের তো দুধে হাত পড়বে না। অর্থাৎ—নিজেদের তো অসুবিধে ঘটবে না—বাড়ির খানিকটা জায়গা ছেড়ে

দিতে! দরকারের অতিরিক্তই তো রয়েছে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত ঘর দালান সিঁড়ি চাতাল, চলনঘর চিলেকোঠা চোরকুঠুরি টুকটাক খুচখাচ ছোট ছোট বাড়তি ঘর।

তবে?

আত্মীয় তো বটেই নেহাত নিস্পরও যদি সেইটুকুর উপসত্বে কিছুটা সুবিধে লাভ করে বর্তে যায়, সে সুবিধেটুকু দেওয়া হবে না তাকে?

তখনও তো—সংসারি মানুষদের জীবনের আদর্শবাণী ছিল, আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে—সকলের তরে সকলে আমরা ইত্যাদি।

সেকালের লোক সংহতি শব্দটার মানে জানত কিনা সন্দেহ, তবে ওটা জানত। যারা নিরক্ষর পাঠ্যপুস্তকে ওই আদর্শবাণীটি পড়বার সুযোগ পায়নি, তারাও কিন্তু মনেপ্রাণে জানত। এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রতিফলন পড়তে দেখা যেত!

বহুদিন ছেড়ে আসা দেশ ভিটের নেহাত নিঃস্ব গ্রামতুতো ভাইটার একটা ছেলে যদি শহরে এসে পড়াশুনো করে মানুষ হবার আকুলতায় কাতর হয়, দেবে না তাকে সেই সুযোগটুকু মানুষ?

সবসময় যে পরিবারের সকলেই সে বিষয়ে অনুকূল হত, তা নয়।

অকারণ ঝঞ্ঝাট উড়ো আপদ এতো ভাল জ্বালারে বাবা—বলে প্রতিরোধের চেষ্টা করত বৈকি। তবে তখনও সংসারে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম প্রথাটি চালু ছিল কিছুটা।

তাই সেই ছেলেটা এসে সে সংসারে ঠাঁইও পেয়ে যেত।

কর্তারাই তো গ্রামতুতো ভাই। তাঁর আর কিছু না হোক চক্ষুলজ্জার দায়ও তো আছে একটা?

অবশ্য আশ্রিত ছেলেটার প্রতি ব্যবহার বিধির ওপর কর্তার কোনও হাত থাকত না! সেখানের অভিজ্ঞতা যার ভাগ্যে যেমন জুটেছে, তবে এভাবে এসে পড়াশুনা করে মানুষ হয়ে যাবার দৃষ্টান্ত নেহাত কম নেই সেকালের সমাজ ইতিহাসে।

দিব্যহাসিনী দেবীর শ্বশুরঘরটি এমনি এক শহরবাসী লক্ষ্মীমন্ত ঘর।

অনেক বিরাট বিশাল বাড়ি না হলেও মোটামুটি লোক সমাজ, আত্মীয় সমাজ সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব বহন করার নিয়ম নীতি পালন করে চলতেন তাঁরা!

তবে—দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

মানুষকে যে মানুষ নামের দায়িত্বটি বহন করতেই হবে, এমন বিশ্বাস দ্রুতই কমে এসেছে। সহসা সহসাই পট পরিবর্তন হয়েছে।

হয়তো বা সহসা নয়।

নদীর পাড়ে ভাঙন সহসা ধরে না। কেউ খেয়াল করে না তলায় তলায় মাটি খইতে শুরু করেছে।

তবে দেখা যাচ্ছে—দিব্যহাসিনীর আমলে নদীর পাড়টি আপাত দৃষ্টিতে অটুটই রয়েছে।

অনেকগুলো পোকায় খাওয়া পাতা সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়ে—কিশলয় চ্যাটার্জির সেই ফুলকি নামের মেয়েটা—(পোষাকি নাম যার স্ফুলিঙ্গ চট্টোপাধ্যায়)

সে আবার যেখান থেকে হাল ধরেছে সেখানে চোখ ফেললেই, সেই আপাত অটুট ছবিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।





॥ ১১ ॥

কী মজা! কী মজা! বাড়িতে একটি বিবাহ হইবে। মেয়ের বিবাহ।

আরও মজা এই, এই বিবাহে বাড়ির কোনও মেয়ে ভিন্নগোত্র হইয়া গিয়া, পরের ঘরে চলিয়া গিয়া, বাড়িতে শূন্যতার সৃষ্টি আর বিষাদের সৃষ্টি করিবে না।

যাহার বিবাহ হইবে। সে এঁদের কীরকম আত্মীয় আমার অবশ্য জানা নাই, তবে কন্যার পিতা, আমার শ্বশুর মহাশয়কে জ্যাঠামশাই ডাকিতেছেন দেখিতেছি।

মগরাহাট নামক কোথায় যেন চাকুরি করেন। সেখানেই বসবাস।

তা অতসব জানিবার আমার প্রয়োজন কী?

একটি বিবাহের আগাগোড়া সব দেখিতে পাইব। এটিই উল্লাস। এযাবৎ যত যা বিবাহ দেখিয়াছি—সে শৈশব বাল্যের সেই রাংচিতাতেই হউক বা, কলিকাতায় আসিয়াই হউক সবই বাহির হইতে উপর উপর দেখা! অর্থাৎ নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া বাবদই!

এ সংসারে আমিই যে সর্বকনিষ্ঠ। তাই আমার পর ইহাদের আর কাহারও বিবাহ হয় নাই। ভাসুর মহাশয়দের সকলেরই পুত্রের ভাগই অধিক। এবং

প্রথম দিকে পুত্রই। কন্যারা বিবাহযোগ্য হইয়াছে কেউ কেউ। কিন্তু তাহারা এখন স্কুলে পড়িতে ঢুকিয়াছে, কাজেই বিবাহে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। একজনের নাকি কথাবার্তা হইতেছে শুনি।

কতদিনে ঠিক হইবে কে জানে।

কাজেই—মুফতে একটি বিবাহ দৃশ্য দেখার আহ্লাদে আমি এখন ভাসিতেছি। কিছু কিছু কাজের ভারও পাইতেছি। যে সব কাজ তুচ্ছ হইলেও সময় সাপেক্ষ। যাহারা বিবাহ দিতে আসিবেন তাঁহারা নাকি বিবাহের মাত্র কয়েকটি দিন আগে আসিতে পারিবেন। কারণ মেয়ের বাবার অফিসে ছুটি বেশি নাই।

আমাদের বৃদ্ধা বিধবা বড়জ্যাঠশাশুড়ি যিনি বাতে পঙ্গু হইয়া বিছানাতেই পড়িয়া থাকেন, এবং একটি দাসী তাহাকে তেল মালিশ করে, ও সর্বদা দেখাশুনো করে তিনিই সেই দাসীকে দিয়া আমাদের ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার কাছে বসাইয়া নানা নির্দেশ দিতেছেন।

আসলে একান্ত অক্ষম হইলেও ইনিই তো বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্য! তাঁহার সব নির্দেশ মান্য করিতে হয়।

অবশ্য বড়দি থাকিতে অন্য ব্যবস্থা ছিল। বড়দিই ছিলেন যেন সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, নীতি নির্দেশদাতা।

কিন্তু সেই বড়দি এখন অনুপস্থিত। এখন নাকি তিনি কেদারবদরির পথে যাত্রা করিয়াছেন তাঁহার দলের সঙ্গে।

এখন সংসারের কাজের গৃহিণী মোটামুটি জ্যাঠতুতো বড় জা। সংসারটি এখনও আমার কাছে প্রায় গোলক ধাঁধা তুল্য! এত লোক, এত দাসদাসী, এত অতিথি অভ্যাগত, কে যে কোন ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না! সর্বদা সকলের পায়ে পায়ে ঘুরি। এই পর্যন্ত।

এখন—এই বিবাহে আমার উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার পড়ায় খুশি।

আমার জিম্মায় এক ধামা সুপুরি আর একটি ভাল ধারালো জাঁতি দিয়া বলা হইয়াছে, এই সুপুরিগুলি মিহি করিয়া কাটিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য ধীরে ধীরেই, এখনও বেশ কয়েকদিন সময় আছে হাতে।

বিয়ে বাড়িতে এমনিতেই তো দৈনিক পান সাজিতে হইবে বিস্তর, আর বিবাহ রাত্রে তো কথাই নাই।

সেই সব পান সাজিবার দায়িত্বও বৌদের উপর পড়িবে। কারণ যাঁহারা বিবাহ দিতে আসিবেন তাঁহাদের লোকবল নাই।

ওই বড় ধামাভর্তি ওই সুপারিগুলি দেখিয়া একটু ভয় খাইলাম বটে, তবে উৎসাহিত হইলাম খুব।

তবে ইহাদের বাড়িতে কাজের ধারা বেশ মজার।

সুপুরিগুলি কুচাইবার আগে, দাসীরা কেউ সেগুলি চিরিয়া দিয়া কাজ সহজ করিয়া দেয়।

এমনকি নিত্য পান সাজিবার সময়ও পানগুলি ভালভাবে ধুইয়া বোঁটা ফেলিয়া চিরিয়া চিরিয়া—ছোট মাপ বড় মাপ হিসাব করিয়া ডাবরের মধ্যে ভিজা ন্যাকড়া চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। খয়ের গুলিয়া রাখে। চুনের ভাঁড়ে জল আছে কিনা দেখিয়া জল দিয়া রাখে।···

পান সাজিতে যে বড় বড় পিতলের থালার গোছা আছে সেগুলিও নিত্য মাজিয়া রাখে।

কাহাকেও কোনও কাজ আগাগোড়ায় করিতে হয় না।

তো যাক কত নিত্যদিনের ব্যাপার। বিবাহ বাড়ির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি!

স্বামীকেও আজকাল খুব কম দেখিতে পাই।

বৈঠকখানা বাড়িতে প্রায় রোজই শ্বশুর মহাশয় ছেলেদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসান। শুনিতে পাই তাঁহার আলোচ্য বিষয়, বিবাহটি যেন এ বাড়ির মর্যাদা অনুসারে হয়। কেউ না ভাবিতে সুযোগ পায়, দূরসম্পর্কের বলিয়া ভাইপোর মেয়ের বিবাহটা চন্দর মুখুয্যে নমো নমো করে সেরেছে।

চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায় নামটিকে তিনি চন্দর মুখুয্যে বলিয়াই অভিহিত করেন।

তাছাড়া সবই যেন সুশৃংখল হয়।

কাজেই—নাকি সময়ের আগে আগেই হালুইকরদের ডাকিয়া রান্নার ফর্দ আর লোকসংখ্যা বলিয়া দেওয়া হইল। সানাইওয়ালাকে বায়না দেওয়া হইল নহবৎখানা বসাইবার ও রোসন চৌকি বসাইবার আয়োজন হইল। নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হইয়া গিয়া বিলি হইতে শুরু হইল। এবং বিবাহের তত্ত্বতাবাস ও নিয়ম লক্ষণের যাবতীয় কাপড় চোপড় কেনা হইতে লাগিল।

আমার বিবাহে ছেলের বিবাহেই এ বাড়ি হইতে অধিবাসের যা তত্ত্ব পাঠানো হইয়াছিল তাই দেখিয়াই তো লোকে হাঁ হইয়া গিয়াছিল। এখন শুনিতেছি—যে সেই দশ বছর আগের কথা। তাছাড়া গ্রামের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানোর হাঙ্গামার চিন্তায় তেমন হয় নাই। আর এতো মেয়ের বাড়ি। দশ বছরে ফ্যাশান ট্যাশান অনেক বাড়িয়াছে। আর পাঠাইবারও অসুবিধা নাই। বরের বাড়ি বেশ কাছেই কী যেন একটা রোডে।

কেবলই গাঁঠ গাঁঠ কাপড় চোপড় আসিতে থাকে। নমস্কারি শাড়িই নাকি চল্লিশখানা। বরের ঠাকুমার জন্য গরদের থান ধুতি! এয়োডালার আলাদা

পাঁচখানি শাড়ি। যা নাকি কুঁচাইয়া বাহার করিয়া সাজাইয়া দিতে হইবে ফুলশয্যার তত্ত্বে।

তাছাড়া দান সামগ্রীর বাসনপত্র বরাভরণের বোতাম আংটি বেনারসি জোড়।

পুরনো জামাইদের জন্য জামাইবরণের ধুতি ননদঝাঁপির দ্রব্য ওঃ সে যে কত কত ব্যাপার। একটি বিবাহে যে এত লাগে, তা কে জানিত!

বরের বাড়ির জন্য ছাড়াও—আরও কতকী কিনিতে দেখিতেছি—বাড়ির যে সমস্ত দাসদাসী তত্ত্বের থালা বহিয়া লইয়া যাইবে তাহাদের জন্য কোরা ধুতি কোরা শাড়ি আসল। সময় থাকিতে সেগুলি হলুদ জলে ছোপাইয়া শুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

এদিকে সেদিকে সদরে অন্দরে কত কী কাজই চলিতেছে। কে তাহার সঠিক হিসাব রাখিতে পারিবে?

বাবাঃ। একটা বিয়েতে এত লাগে?

তবে গরিবদের কি এত লাগে? যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক দায়।

এরই মধ্যে আজ রাত্রে সকলে একত্রে খাইতে বসিয়া শ্বশুর মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা আগে মনে পড়েনি, এখন হাতে তো দেখছি সময় অল্প। বিয়েটা যখন এখান থেকে হচ্ছে তখন সনতের মেয়েকে একখানা ভালমত গহনা দেওয়া তো উচিত! বৈকুণ্ঠকে একবার ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করলে হত না। দিনতিন চারের মধ্যে একখানা নেক্‌লেস কি কিছু গড়ে দিতে পারবে কি না। নচেৎ-তো সেই—

নেকলেস !!

কথা শেষ হওয়া মাত্রই আমার তিন খুড়শ্বশুরই প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মেজদা?

মেজদা অর্থাৎ আমার শ্বশুর মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? তাই মনে হচ্ছে তোমাদের?

এবারও একত্র উত্তর তা হচ্ছে বৈকি। তুমি করে চলছো, আমরা কিছু বলছি না। তবে আতিশয্য যে হচ্ছে, তা তো ঠিক। সনৎ বোধহয় আমাদের সাত পুরুষ দূরের জ্ঞাতি। কেউ মরলে এখন আর অশৌচ লাগে কি না, ঠিক নেই। অথচ তুমি এমন রাজাই-চাল জুড়ে দিয়েছ—যেন বাড়ির মেয়েরই—

সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাসুররাও (যেন সুযোগ পাইয়াই—) বলিয়া উঠিলেন, আমরাও তাই বলাবলি করছি। আপনার ইচ্ছের ওপর তো কথা বলতে পারি না।···এ বাড়ি থেকে বিয়েটা দিতে পাবে এটাই তো যথেষ্ট। শুনছি বিয়ের তিনদিন মাত্র আগে আসবে। তার মানে স্রেফ নেমন্তন্ন খেতে আসার মতো।

এত কেন ? এটা তো তাকে প্রায় অপদস্থ করাই। ঘোমটার মধ্যে হইতে মুখ দেখিতে পাইলাম না, তবে কথা শুনিয়া বুঝিলাম একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। কেমন যেন আলগা গলায় বলিলেন, অপদস্থ !

তা নয় ? সনতের মেয়ের বিয়েতে এত সমারোহ হবার কথা ? সে ভাববে এটা তার কাছে আমাদের জাঁক দেখানো ! আপনি হয়তো উদারতা দেখাচ্ছেন, কিন্তু সে তা ভাববে না ! যেখানে আদৌ পাবার কথা নয়, সেখানে অনেক বেশি পেয়ে গেলে যে সবাই খুব খুশি হয়, তা নয় বাবা। পাওয়াটাও একটা ভার।

আহা ! বেচারি বাবা ! কেমন যেন মলিন হইয়া গিয়া আস্তে বলিলেন, আমি এদিক দিয়ে ভাবিনি বাবা। অনেক দিন পরে বাড়িতে একটা বিয়ে লাগছে, দেখে মনটায় খুব উৎসাহ আসছিল। নিজের পৌত্রীদের কারও বিয়ে তো হাতের নাগালে নেই। তাই আগেকার দিনের সব কাজ কর্মের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।···মনে আছে টুনির বিয়ের সময় ? সে কী ঘটা। বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন—

কথার মাঝখানে হঠাৎ যেন স্বরবন্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন। সামান্য ক্ষণ খাবার নাড়া চাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

হঠাৎ মনে হইল যেন একটি জ্বলন্ত মশালকে কেউ জল ঢালিয়া নিভাইয়া দিল।

আমার ভারি কষ্ট হইল। আহা গুরুজনের মনে এমন ভাবে আঘাত দিতে আছে ?

কপালক্রমে আজই খাওয়ার আসরে আমার স্বামী উপস্থিত ছিলেন না। কোন মক্কেলের বাড়িতে কী উপলক্ষে যেন নিমন্ত্রণ ছিল।

আমার মনে হইল তিনি উপস্থিত থাকিলে বোধহয় এমন হইত না। তিনি নিশ্চয় বাবার দিক হইয়াই কথা কহিতেন।

খুড়শ্বশুর ও ভাসুরদিগের কথার ধরন দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা যেন এই কথাগুলি বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন।

তলে তলে মনে মনে গজরাইতে ছিলেন। কথার আভাস পড়িবামাত্র মনের ভিতরকার জমিয়া ওঠা সব বিষটি ঢালিয়া দিলেন।

মেয়ে মহলে অবশ্য উৎসাহ উল্লাসের মধ্যেও—সর্বদাই ইশারা ইঙ্গিতে—
এই মনোভাবই প্রকাশ হতে দেখি।
বাড়াবাড়ি।
বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করা হইতেছে।
নিজের পৌত্রীর বিবাহ আসিতেছে না ?

আজ কালই না হোক, দুইদিন বাদেই তো হইবে। পরের মেয়ের বিয়ের এত কেন ?

তবে আসল খুশি হইয়াছে, বাড়ির দাসদাসীরা।

সকলের মুখেই একই কথা, বাবা। কতদিন বাদে বাড়িতে একটা বে লাগল।

আমার এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে বাড়িতে কি তাই বলিয়া কোনও উৎসব লাগে নাই ?

ভাত পৈতে সাধভক্ষণ ইত্যাদি ঘটনা উপলক্ষে ঘটাপটা হইয়াছে বৈকি।

তবে বিয়ে !

সে একটা আলাদা জিনিস !

তার আমোদই অন্য !





॥ ১২ ॥

রাত্রে স্বামী ফিরিয়া বলিলেন কী ব্যাপার ? বাবা দেখলাম এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছেলেরা কেউ বাইরে থাকলে, তো বড় একটা ঘুমোন না। জেগে বসে বইটই পড়েন। শরীর টরীর ভাল আছে তো ?

আমি তো আর প্রকৃত কথা বলিয়া বসিতে পারি না। তাই সাবধানে বলিলাম, শরীর ? ভালই তো আছে।

উনি বলিলেন—

বিয়ে বিয়ে করে মনটাকে খুব খাটাচ্ছেন তো। হঠাৎ যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে উঠেছেন। আর কেবলই আমাদের বোঝাতে চাইছেন সনৎদা আমাদের নেহাতই আপন জন। বর্ধমান জেলার সেই ওঁদের নন্দীগ্রাম না কীর মুখুয্যেদেরই বংশ ! একই গাছের ডালপালা।

বার বার মনে হইতে লাগিল তখনকার কথাটা বলিয়া ফেলি। কিন্তু পরিকল্পনা বলিতে গিয়া আটকাইয়া গেল।···

সেই কথা তুলিয়া উনি যদি ওঁর দাদাদের বা কাকাদের কিছু বলেন ?

বলিতে পারেন। বাবাকে যে ইনি বড্ড বেশি ভালবাসেন।

কিন্তু কিছু বলিয়া বসিলে তাঁহারা যদি প্রশ্ন করেন তুই একথা জানলি কী করে? তুই তো আজ বাড়ি ছিলি না তখন।

তখন?

কী উত্তর দিবেন উনি?

নাঃ। সংসার জায়গাটা বড়ই গোলমেলে!

স্বামী গা হইতে এসেন্স সুরভিত জরিপাড় উড়ুনিটি খুলিয়া আলনার উপর চাপাইয়া রাখিয়া কাছে আসিয়া কহিলেন, খুব রেগে আছ? কেমন?

আমি তো অবাক।

রেগে আছি? কেন?

উনি বলিলেন, কেন তা তুমিই জানো। তবে রয়েছ, সেটা নিশ্চয়। মুখখানিতে তো দিব্যহাসির বদলে আষাঢ়ের মেঘ!

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, য্যাঃ কী যে বল! আমি বুঝি শুধু শুধু রাগ করার মতো মেয়ে?

আহা, তা নয় বলেই তো চোখে পড়ছে। তাহলে রাগ করোনি?

মোটেই না।

তাহলে কি মাথা ধরেছে?

মাথা শত্রুর ধরুক!

শত্রুর? তোমার আবার শত্রু আছে? কোথাও?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম, তা তো ঠিক। জন্মে পর্যন্তই তো দেখছি সব্বাই আমায় ভালবাসে!

উনি দুষ্ট হাসি হাসিয়া নিজের বুকে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, কেবল মাত্র এই হতভাগা বাদে। তাই তো?

কৌতুকেরই কথা। তবু—

আমি চটিয়া ওঠার ভানে বলিয়া উঠিলাম। আঃ! ভাল হবে না বলছি।

উনি খাটের উপর আমার কাছ ঘেঁষিয়া গুছাইয়া বসিয়া বলিলেন, তাহলে বলছ বাসি? তা ভালটা হল কই? এতক্ষণ পরে দেখা হল, উচিত ছিল তো—এসেছো প্রাণেশ্বর? বলে ঝাঁপিয়ে বুকে এসে পড়া!—ছিল না উচিত?

আচ্ছা—এরপরও হাসিয়া ফেলা ছাড়া উপায় থাকে? মন থেকে বিষাদের মেঘ উড়িয়া যায় না?

ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতায় বুক ভরিয়া যায় না?



॥ ১৩ ॥

আজ কনে পার্টির সকলে আসিয়া পড়িলেন। আর আসা মাত্র স্বাভাবিক আদর আপ্যায়নের হৈ হৈয়ের পর, এঁদের সনৎদা এদিক ওদিক দেখিয়া শুনিয়া এমন হৈ চৈ শুরু করিলেন, তাহাতে—শ্বশুর ঠাকুর যেন কোণঠাসা হইয়া পড়িলেন। মনে হইতে লাগিল আমার ভাসুরগণ ও খুড়শ্বশুরগণেরই জিত হইল। শ্বশুর ঠাকুরেরই হার।

ওই সনৎদা প্রথমটা তো শুরু করিলেন, এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন জ্যাঠামশাই? কমলির বিয়ের জন্য এত সমারোহের আয়োজন? এসে দেখে শুনে যে মনে হচ্ছে—কোন রাজকন্যের বিয়েতে দৈবাৎ এসে পড়েছি! একনজর দেখেই তো মাথা ঘুরে গেছে!···অতঃপর এই সুরই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন —নানা মন্তব্যে, নানা ভাবে।

কমলি নামের মেয়েটা সে সামান্য একটা রেলবাবুর মেয়ে, সেটা নাকি তাঁর জ্যাঠামশায় ভুলিয়া বসিয়াছেন। ইত্যাদি প্রভৃতি। তাহার পর এও বলিলেন, ও জ্যাঠামশাই। বরপক্ষের যে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে গো! ভাববে কী তালেবর একটা বেয়াই পেয়ে গেছি!···আপনার সরকার মশাই হাসতে হাসতে বলেন, তবু তো এখনও বরযাত্রীদের খাওয়ানোর রান্নার আলাদা বিশেষ

ফর্দ দেখেননি!···নাঃ আপনার দেখছি বয়েস হয়ে—ভুল ভাল হয়ে গেছে। তো এই এলাহি কাণ্ড ফেঁদে বসায় আপনাকে কেউ বুঝ দিতে বাধা দেয়নি? ছেলেরা? ভাইয়েরা?

এতেও যদি কোণঠাসা হওয়া না বলা হয় তো আর কিসে বলা হইবে?

অনেকক্ষণ এই বাক্য স্রোতের পর একসময় শ্বশুর মশায় খুব শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, হ্যাঁরে তোর কমলি কি শুধুই সনৎ মুখুয্যেরই মেয়ে? চন্দরকিশোর মুখুয্যের নাতনি নয়? নন্দীগ্রামের মুখুয্যেদের বংশের নয়? তার পক্ষে এটুকু কি খুব বাহুল্য?

মুহূর্তে ওই সনৎদা যেন থতমত খাইয়া গেলেন।

তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া শ্বশুর মশায়ের দুটি পা ছুঁইয়া পায়ের ধুলো মাথায় দেওয়ার ভঙ্গিতে কহিলেন, মুখ্যুটাকে মাপ করে দিন জ্যাঠামশাই। আমার ঘাট হয়েছে।

কিন্তু কমলি যে শুধু সনৎ মুখুয্যের মেয়েই নয়, তাহার অন্য পরিচয়ও আছে, সে কথাটি কি তিনি শুধু ওই সনৎ মুখুয্যেকেই মনে পড়াইয়া দিলেন? আর কাহাকেও নয়?





॥ ১৪ ॥

আচ্ছা ফুলকি ? তোর হলটা কী ?

ফুলকির মা শ্রীমতী সুচেতা, অভ্যস্ত নিয়মে দুহাতে দুটো কাঠি নিয়ে কী যেন বুনতে বুনতে মেয়ের কাছে সরে এসে বলে উঠল, সেই ওই পচা খাতাখানার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছিস। আজ শিল্প মেলায় যাবার কথা ছিল না ? মনে নেই ?

ফুলকিও অভ্যস্ত নিয়মে মাকে প্রায় ডাউন করে ফেলার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, আঃ মা ! থামোতো ! ঠিক হিসেবের সময়টিতেই মাথাটা গুলিয়ে দিলে। শিল্প মেলা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। রাত আটটা পর্যন্ত তো খোলা থাকবে। আর থাকবে—আজ-কাল-পর্শু তস্যু, নস্যু, থস্যু—এখন চটপট বল তো—বঙ্গাব্দকে খ্রিষ্টাব্দয় পরিণত করতে চটজলদি অংকটা কী ?

বঙ্গাব্দকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করতে ?

সুচেতার হাতটা খানিক খুলে গেল।

কী এটা ? কোনও ধাঁধাঁ না কি ? সেই যে কবে কোথায় পড়েছিল, মিহি-

জামকে পোষ মানাও তো ?

সুচেতা শত মাথা ঘামিয়েও পারেনি! অথচ ওর ছোট বোন উত্তরটা তক্ষুণি বার করে ফেলেছিল। বলেছিল, মন দিয়ে পদ্ধতিটা পড়ে নিবি তো ? …দেখছিস না দুটো করে অক্ষর বাদ, আর দুটো করে নতুন অক্ষর যোগ করা—মিহিজাম, জামতাড়া, তাড়াতাড়ি—তাড়িখোর, খোরপোষ, পোষমানা তো সে তো তখন মনে হয়েছিল। জলের মতো সোজা। কিন্তু বঙ্গাব্দকে খ্রিণ্টাব্দ করা।

নাঃ বাপু তোর ধাঁধাটা বুঝলাম না।

জানি! তুমি বুঝবে না। দেখি পরে যদি বাবাকে বলে নয়তো কলেজে গিয়ে—ক্যালকুলেটার কী কমপিউটার দিয়ে—যাকগে! সে পরে হবে। এখন ভারি ইণ্টারেস্টিং একটা আবছা কালিতে লেখা জায়গা উদ্ধার করে ফেলে—ওই অব্দটা নিয়ে আটকে গেছি।

ফুলকি! কী আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিস? রাতদিন ওই ভুতুড়ে কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে ঘাড়ে ভূত চাপল নাকি?…টান মেরে ফেলে দে তো ওগুলো!

ফুলকি বলে ওঠে, আহা! তা আর নয়! ফেলে দেবে।…এখন বলে বঙ্গাব্দ তেরোশো এক (তাং চৌঠা ফাল্গুন) মনোহরপুকুরের এক বিয়ে বাড়িতে সবে এসে বসেছি। ডিসটার্ব কোরোনা বাপু!



॥ ১৫ ॥

বালির স্তরের নিচে বহিয়া যাওয়া অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো—সংসারে তলায় তলায় যতই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বিরূপতা অসন্তোষ, এবং কখনও কখনও তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো টুকটাক মন্তব্য চলিতে থাকুক, আরব্ধ শুভকাজটি ঠিকই ঠিকমতো হইতে লাগিল।

মজা এই—বিরোধ বিরূপতা সত্ত্বেও বিয়ে বাড়ির খাওয়া মাখা আমোদ আহ্লাদ, বাইরে থেকে আসা আত্মীয় কুটুম্বদের সহিত গাল গল্প। আবার দাসদাসী চরাইতে ডাক হাঁক ইত্যাদির সুখটি মেয়ে পুরুষ সকলেই বেশ চুটাইয়া উপভোগও করিয়া নিতেছেন।

মেয়ে মহল তো দেখিতেছিই, পুরুষদেরও—কিছুটা অনুভব করিতেছি বৈঠকখানা ঘর হইতে ঘন ঘন ভৃত্যদের ডাক পড়ায়। পান সিগারেট খাবার জল, কিম্বা খাবারেরও হুকুম হইতেছে।

বাড়িতে ভিয়ান বসাইয়া নানা রকম খাবার বানানো হইয়াছে। যজ্ঞির জন্য রসগোল্লা লেডিক্যানিং ও ক্ষীরমোহন বানানো হইয়াছে, এবং সর্বদা জল-পানের জন্য খাস্তা গজা জিভে গজা বোঁদে ও মেঠাই। স্তূপাকার ব্যাপার। আবার নোনতা হিসাবে কুচো নিমকিও হইয়াছিল।

দাসদাসী মুটে মজুর এবং কাজের বাড়িতে খাটিতে আসা নানা কাজের লোককেই এইসব দিয়া জল খাবার দেওয়া হইতেছে।

পুরুষেরা ইচ্ছা শখে চাহিয়া পাঠাইতেছেন, দেখি বংশী ঠাকুর আর মুরারী ঠাকুর রাতভোর কী সব তৈরি করল চেখে দেখি।

এখানে একটা জিনিস দেখি কাজ-করিয়ে লোকেদের জন্য মুড়ির ব্যবস্থা নাই। নিত্য দিনের লোকেরা জলখাবার পায় দোকান হইতে কিনিয়া আনা তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি বা জিলিপি। কেউ কেউ আবার আপন পছন্দে দৈনিক চারবার ভাতই খায়।

বাসন মাজার ঠিকা লোক হরিপদর মা তো, তাহার হরিপদকে লইয়া আসে। এবং দুজনেই ভাত খাইয়া যায়। বাসন ঠাকুরকে বাবা ডাকিয়া তোয়াজ করে বলিয়া, সেও বেশ যত্ন করে। দেখিলে বেশ ভাল লাগে। উড়িষ্যা দেশের লোক অথচ বাংলা কথা এমন সহজে বলে অবাক লাগে। আমায় যদি কেউ উড়িয়া ভাষায় কথা বলিতে বলিত ? ওরে বাবা ! ভাবিলেই হাসি পায়।

নাঃ, বিবাহ বাড়ির কথাটাই সাঙ্গ করি—

বলিতেছিলাম না কাজকর্ম যেন কলে হইতেছে। ঠিক তাই।

হালুইকরেরা ঠিক সময় আসিয়া ভিয়ানের উনুন পাতিয়া রাখিয়া গেল। পরামানিক ঠিক সময় আসিয়া উঠানের মাঝখানে শিল পাতিয়া চারিদিকে চারটি ছোট্ট ছোট্ট কলাগাছ বসাইয়া কলাতলা তৈয়ার করিয়া গেল। শিলের উপর দাঁড়াইয়া তো সকল বরণ টরন ! যেটি বিবাহ রাত্রে ছাঁদনাতলা হইবে। আবার ভোররাত্রে আভাঙা জল আনিয়া একধারে রাখিয়া গেল। বিবাহের দিন বিকালে কনে সাজিবার আগে কনে কলাতলায় চান করিবার সময় যে আইবুড়ো মুচি ভাঙিবে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেল।

ব্যবস্থা আর কী, চারকোণে চারটি মাটির খুরি চাপা দিয়া চারকড়া করিয়া কড়ি, চারটি করিয়া হলুদ ও চারখানি করিয়া আস্ত হলুদ রাখিয়া দেওয়া।

কলাগাছ ঘিরিয়া যে সাত খেই জড়ানো থাকে, কনে প্রতিবার শিল থেকে নামিয়া সেই খুরির উপর পা চাপিয়া বলে, আইবুড়ো মুচি ভাঙলাম।...এই আইবুড়ো মুচি ভাঙলাম।

আবার ঘুরিয়া সুতা ডিঙাইয়া শিলে ওঠে।

কী মানে ইহার ? জানা নাই। মনে পড়িতেছে, আমাকেও এইসব করিতে হইয়াছিল।

আরও কত কীই যে করিতে হইয়াছিল। গোনা গুনতি নাই। তবে তখন কিছুই লক্ষ করি নাই। সে সময়ের স্মৃতি—কেবলই কষ্ট ক্লান্তি আর বিরক্তি। কেবলই মনে হইয়াছে—এবার আমায় ছেড়ে দাও বাবা তোমরা !

আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি। যতসব উদ্ভুটে কাণ্ড।

এখন লক্ষ করিয়া দেখিয়া ওইসব উদ্ভুটে কাণ্ডগুলির অর্থ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি। দধিমঙ্গল জলসওয়া ওই আইবুড়ো মুচি, আভাঙা জলে হাত ডুবাইয়া বসিয়া থাকা, মোনামুনি ভাসানো, হাই আমলা বাটা, কনেকে সাতপাক ঘোরানোর পেল্লায় পিঁড়িখানার তলায় খড়ি দিয়া সম্পর্ক বিচার করিয়া আঠারো জোড়া দম্পতির নাম লিখিয়া রাখা। যাঁরা বিশেষ করিয়া পতিপ্রাণা সতী এবং পত্নী প্রেমিক পতি।

তারপর—বরণকালে জামাইয়ের হাত বাঁধা, কনের পায়ের তলায় বরকে দিয়া দাসখৎ লেখানো—নাঃ অসংখ্য অগাধ।

কোনও কিছুরই মানে খুঁজিয়া পাই না।

এসব না কি স্ত্রী আচার! শাস্তরের ব্যাপার নয়। শুধু মেয়েদের আমোদ আহ্লাদ।

পুরোহিত মশাই তো তাই বলিলেন।

তিনিও ঠিক নিয়ম মতো সময়ে—নিজের থেকেই আসিয়া, বিবাহের লগ্ন, সময়, ইত্যাদি ভালভাবে লিখিয়া দিয়া গেলেন। তবে যাত্রাকালে ওই একটি ঠোক্কর দিয়া গেলেন।

এই আপনাদের সব বলে গেলাম বৌমারা। স্ত্রী আচার টাচার গুলো একটু আগে আগে সেরে নেবেন। অনেক বাড়িতে দেখেছি মেয়েছেলেদের ওই আমোদ আহ্লাদের বহরে—লগ্ন পার হতে বসে।

তার কারণ স্ত্রী আচার সারা না হইলে কন্যা সম্প্রদান করিতে বসা যায় না!

অথচ বলিলেন, ওটি শুধু মেয়েছেলেদের আমোদ আহ্লাদ। তা তাহাতে যদি লগ্ন পার হইতে বসে তো, জোর হুকুম দেন না কেন ওসব তুলিয়া দিতে। তাতো দেন না। মেয়েছেলেদের এই অর্থহীন উদ্ভুটে আমোদ আহ্লাদকে প্রশ্রয় দেন কেন? ওঁরাই তো নিয়ম কানুনের কর্তা!

আমি তো বাবা এই হাজার রকম নিয়মের মধ্যে মাত্র একটার মানে খুঁজিয়া পাই। এই বিয়ের দিন ভোর সকালের দধিমঙ্গল।

আসলে শাস্ত্রীয় নিয়মে বর কনেকে সেদিন উপবাস করিতে হয়, খিদে পাইতে পারে। পিত্ত পড়িতে পারে। তাই দিন শুরুর আগেই পেট পুরে দই চিঁড়ে খেয়ে থাকো বাছারা। পিত্তরক্ষা হইবে।...

তবে আরও একটি ব্যাপার কনের বাবা না হয় কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া উপবাস করিয়া থাকিবেন, তাও ডাবের জল সরবৎ বা দুধ খাওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু কনের মা? তাঁর জন্য একেবারে নির্জলার ব্যবস্থা।

কেন? না মা যত শুকোয়, মেয়ের ততো সুখ হয়?

কী অর্থহীন? কী বিশ্রী প্রথা। এর কোনখানে যুক্তি আছে?

ওঃ এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমি মারা গেলাম ! কমলার বিয়েটা এত খুঁটিয়ে দেখার ফলেই এত প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছে।

আচ্ছা—এই যে যত সব মঙ্গল কাজ, যা কেবলমাত্র দুটি মানুষকে জন্ম-জন্মান্তরের মতো জোড় মেলানোর আয়োজন, তাহাতে সকল ব্যাপারেই বিজোড় সংখ্যাই দরকার কেন ? এয়ো নির্বাচনে, জোড় সংখ্যা হইয়া গেলে, হয় আরও একটিকে জোগাড় করো, নয়, একটিকে বাদ দাও। তা বাদ দেওয়াটা খুব অসুবিধের। মনক্ষুণ্ণ করা অবমাননা করা, আহত করা। নয় কী ? তার বদলে পাড়া উটকে আর একটি এয়োই আনা হোক। কিন্তু শুধু এয়ো হইলেই তো হইবে না, জাতে গোত্রে মিল হওয়া চাই তো।

সে যাক কেবল একটি ব্যাপারে দেখি—যুগল সংখ্যা। মাত্র দুটি এয়োরই কাজ—যেটি হচ্ছে হাই-আমলা বাটা। ও মোনামুনি ভাসানো।

হাই আমলা আর নোনামুনি জিনিসটা যে কী তা—জানা নাই। পরামানিক আনিয়া দিয়াছে। মোনামুনি দুটুকরো শিকড়ের মতো।

একটি পাথরের থালায় জল রাখিয়া সেই মোনামুনিদের ভাসাইয়া দিতে হয়, তারা ভাসিতে ভাসিতে যতক্ষণ না একত্রে ঠেকে, ততক্ষণ দুই এয়ো মিলিয়া পাথরের থালাটি নাড়িতে হয়। এয়োদের মুখে একমুখ পান থাকা দরকার !

তবে মজা এই সেই সময় খুব ভারিক্কি থাকিতে হয়। আর হাই আমলা বাটিবার সময় দুই জনে খুব হাসিতে হয়। অকারণ হাসিতে গিয়ে হাসি আসিয়াই যায়। সে সময় দুজনারই গালভর্তি সন্দেশ থাকার নিয়ম।

শুধু তাই নয়, এ কাজে—দুই এয়োর মাথায় শুভদৃষ্টির ধরনে একটি উড়নির ছাউনি দিতে হয়। যাতে অপর কেউ হাসিটা না দেখিতে পারে।

কী রহস্য আছে এই নিয়মের মধ্যে ? কী উদ্দেশ্য ? এর ফলে বরকন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন্ ছক আঁকা হয় ?

ওই হাই আমলার ব্যাপারে আবার আরও একটি শর্ত থাকে। ওই দুই এয়ো বাছাই করিতে হইবে, যারা নাকি অতিমাত্রায় বরসোহাগি।

মগরাহাটি হইতে কনের দিদিমা আসিয়াছিলেন কনে পার্টির সঙ্গে। তাঁহার নাকি এই এরা ছাড়া তিনকুলে আর কেহ নাই। তাই মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতেই বসবাস।

তা ওই দিদিমা মানুষটি খুব আমুদে। চাঁচা ছোলা গলা। অচেনা বলিয়া আড়ষ্টতা নাই !

তিনিই আমার খুড়শাশুড়িদের উদ্দেশ করিয়া হাঁক দিলেন। ও

বেয়ানরা ? আমি তো ভাই এখানে নতুন আসা মানুষ, বলি তোমাদের কোন কোন বৌ সবচেয়ে বর সোহাগি ? তাদের ডেকে এনে হাই আমলা বাটতে বসাও।

একজন হাসিয়া উঠিয়া চটপট বলিয়া উঠিলেন, সবচেয়ে সোহাগি ? তাহলে তো আমাদের রাঙাবৌমাকে ডাকতে হয়। তবে--

বলিয়াই থামিয়া গেলেন।

দিদিমা বলিলেন, তবে টা কী ? বলি চুপ করে গেলে কেন গো ?

কে যেন তাঁহার কানে কানে কী বলিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম দালানের এ কোন হইতে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন ও মা ! সে কী কথা ? কত বয়স ওর ? কচি ফুলটি তো !

উত্তর শোনা গেল না, তবে দিদিমার চাঁচাছোলা গলার চাপা শব্দও কানে আসিয়া পৌঁছাইল।

দশ বছর বে হয়েছে তো কী? বয়েসটা কত ? ওরে আমার যে বের ষোলো বছর পরে প্রথম সন্তান পেটে এসেছিল। এই আমার সুশীলা বালা। গোছা গোছা মাদুলি কবচ ধারণ, আর সাতশো দেবতার দোর ধরে ওই মেয়ে। তো মেয়ে হলে কী ! একাই একশো। ওই তো আমায় রক্ষে করে আসছে। কী ষোলো বছর পরে শুনে পেত্যয় হচ্ছে না ? তো হিসেবে তো পড়ে। ন বছর বয়সে বে হয়েছিল, আর চব্বিশ বছরে মেয়ের মা। কত হলো ? মেলাও হিসেব। তবে—ওই কচি ফুলটির গায়ে এখুনি একেবারে বাঁজা ছাপ দেগে দেওয়া কেন ভাই ? ও নাতবৌ বলি খুব বুঝি বর সোহাগি ? আহা তা হবে না ? রূপখানি কেমন ? পুরুষ তো কোন ছার, এই আমারই মেয়ে ছেলে হয়ে ভালবাসায় পড়তে সাধ যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে কী হাসির ঢেউ।

এমনি আমুদে মানুষ।

হাসি দেখিয়া সকলেই হাসিয়া গড়ায়।

এক একজন মানুষ থাকে, যাহাদের উপস্থিতিতেই বাতাস হাল্কা হইয়া যায়। চির গোমড়া মুখেও হাসি ফোটে।···সব দিকেই যেন প্রসন্নতার হিল্লোল বয়।

আবার তার বিপরীতও আছে বৈকি।

যেমন আমার সেজ খুড়শাশুড়িটি।

যাক বাবা গুরুজনের কথায় কাজ নাই !

মন্দ জনের কথাতেও দরকার নাই।

ভাল জনের কথা বলাই ভাল।

কিন্তু বলিতেছি কাকে ?

কাহাকেও তো নয়। শুধু নিজেকেই নিজে বলিয়া চলিতেছি। বলাটা তাই উচ্চারণে নয়। নিরুচ্চারে!

দিদিমার উদার আশ্বাসে হাই আমলা বাটিতে বসিয়া সারা মন প্রাণে যেন কী এক আহ্লাদের শিহরণ!···সন্দেশ গালে দিয়া—জোর করিয়া হাসিতেছি। কিন্তু আহ্লাদে চোখে জল আসিতে চাহিতেছে।···





॥ ১৬ ॥

ভাই খাতা! কতদিন পরে আবার তোমার কাছে আসিলাম।···বিয়েবাড়ির গোলমালে এতদিন তোমার কাছ বরাবরই আসা হয় নাই। আহা তুমি নিরীহ জন, মান অভিমানের বালাই নাই, তাই।

তো হঠাৎ সেই ছেলেবেলায় মেজদির গোলাপজল পাতানো মনে পড়িয়া যাওয়ায়, মনে হইতেছে—তোমার সঙ্গে তো বলিতে গেলে আমার একরকম সখিত্ব সম্পর্ক। তোমার কাছেই তো নিভৃতে মনের কথাগুলি ঢালিয়া দিই।

তাহা হইলে—তোমার সঙ্গে একটি কিছু পাতাই না?

আচ্ছা—যদি মনের কথা পাতাই? এমন পাতানও আছে। তবে তোমার সঙ্গে কিছু পাতাইতে—কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কোনও উপকরণের বালাই নাই। তবে আজই এখনিই পাতানো যাক না।

ভাই মনের কথা!···

এই যে বিয়েবাড়ির কত কীই ঘটনা। কোনটা বলি, কোনটা ছাড়ি।

কমলার কনে সাজটাই বলি—

আহা কী সুন্দরই না দেখাইতেছিল। এই তো কাঁদনই দেখিতেছি, কে বুঝিয়াছিল ও এত সুন্দর।

কেমন দেখাইতেছিল ?

ঠিক যেন মহারানীর মতো। না না বলিতে হয়—দেবী প্রতিমার মতো। ···গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের সাজ।

গহনা অবশ্য অনেক পরিয়াছিল, মা বাপ না কি তলে তলে একটু একটু করিয়া গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কমলার পর আর তো কোনও মেয়ে নাই। ওর দিদি বিমলাও একটি সুন্দর সিঁথি ও ঝাপটা দিয়াছে উপহার স্বরূপ। মুখে খুব মানাইতেছে। ওর জামাইবাবুটির রেলের চাকুরি। ভাল রোজগারি।

কমলার দিদিমাও একজোড়া বাউটি দিয়াছেন।

এ বাড়ির কথা বলি—

আমার শ্বশুর মহাশয় সেই যে নেকলেস দেওয়ার কথার মুখ ছোপ্ খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর আর উচ্চ বাচ্য ওই নিয়া করেন নাই। তদবধিই গম্ভীর, ম্রিয়মান।

স্বামী একদিন আমার কাছে কহিলেন বাবার শরীরটা বোধহয় তেমন ভাল নেই। কেমন যেন চুপচাপ। বিয়ে বিয়ে করে অত উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন—

তখন আমি চুপিচুপি সেদিনের কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম।

এবং খুব সন্তর্পণে বলিলাম, আমার তো গলার গহনা তিন চার খানা। পুষ্পহার, সীতাহার, কণ্ঠশ্রী, সাতনরী। আরও কিছু কিছু। চিক ও তো দুটি !···এই সব গহনা—বিয়ের সময় তোমরাই সব দিয়াছ। তা থেকে একখানি দিলে কি দোষ হয় ?

উনি বলিলেন, দোষ হওয়ার কিছু আছে কিনা, তা জানিনা। তবে তোমার জিনিস দিয়ে দেবে ? মেয়েদের শুনি গহনা অন্ত প্রাণ।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম সব মেয়ের কথা জেনে বসে আছ বুঝি ? দাওনা গো তার থেকে একটা।

উনি বলিলেন, কই দেখি কেমন জিনিস। কাকে কী বলে ! বেশ ভাল ভাল নাম তো ঢের আওড়ালে।

তখন জানাইতে হইল তোলা গহনা তো বৌদের কারও নিজেদের কাছে থাকে না। বাবার ঘরের দেয়ালের গায়ে গাঁথা আয়রণ চেস্টের মধ্যে, সকলের গহনার বাক্সগুলি ঢোকানো থাকে। নিমন্ত্রণ যাইতে দরকার পড়িলে—বাবাকে জানাইতে হয়। বাবার সামনে বাহির করিয়া লওয়া হয়। আবার তোলার সময়ও তাই।

অবশ্য বড়দি থাকিতে, তাঁর কাছেই সিন্দুকের দ্বিতীয় একটি চাবি

থাকিত। তিনিই চাবি ঘোরানোর আগে কী সব যেন সাংকেতিক শব্দ সাজাইতে হয়, তা জানিতেন। বাড়ির আর কেহ সেই সাংকেতিকটি জানে না। কাজেই বাবাকে বলিতে হয়।

উনি বলিলেন, তবেই তো মুস্কিল। তবে এক কাজ করলে হয়। বিয়েতে পরতে তোমারই চাই, বললে হয়।···কিন্তু মনস্থির করো আগে।

আমি তো রাগিয়া মরি।

মনস্থির আবার কি? ভারি তো কথা। তবে বাবা বকবেন কিনা সেই ভয়?

উনি বলিলেন, তা বটে! সেটা একটা কথা।

তারপর দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, উনিই সেদিনের কথা উল্লেখ না করিয়া বলিবেন এ বাড়ি থেকে বিয়ে হচ্ছে বড়জ্যেঠিমার হাত দিয়া—ভাল গহনা একটি দিলে ভাল দেখায় বলে বাবাকে বলা—এখন তো আর গড়াবার সময় নেই, রাঙাবৌ বলছে। ওর একধরনের অনেকগুলো রয়েছে—ওই থেকে একটা দেওয়া হোক।

সেইভাবেই বলা হইল।

শুনিয়া বাবা বলিলেন, বড় বৌদিদের হাত দিয়ে দেবার কথা বলছিস? তা ভাল। সেটাই মানায়। তবে তোরই যখন এই চিন্তা। পরে বৌমাকে কিছু গড়িয়ে দিস।

আমার প্রস্তাবে যেন বেশ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, আমার দায় পড়েছে আবার গড়িয়ে দিতে। একটা গলায় কটা পরবে?

তো ওঁর তো ওই রকমই কথা! বাবার সঙ্গেও।

সেই পুষ্পহারটিও পরিয়াছিল কমলা। ঝকমক করিতেছিল। মুক্তা পাথর বসানো তো।

তবু একথা বলিতেই হইবে, সত্যিকার ফুলের গোড়ে মালাটি পরানোর পর যে অপূর্ব দেখাইল তাহার তুলনা নাই।

ভাবিলাম, মেয়েরা এত গহনা গহনা করে, ফুলের গহনা পরিয়া নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ চালু করিলে কেমন হয়? তাহাতে অনেক মনকষ্ট, অনেক কলহ কোঁদল অনেক মান অভিমানের কটুতা হইতে রেহাই পাওয়া যায়!

কমলাকে বলিলাম, কী ভাই, কেমন লাগছে?

ও হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, বড্ড ভয় করছে।

ভয়! তা আমারও খুব ভয় করিয়াছিল। মেয়েদের জীবনটাই এই। সর্বদাই ভয়। সুখ, আর ভয় যেন একসঙ্গে ল্যাপটাইয়া থাকে।

এখনও, বিয়ের এতদিন পরেও রাত্রে ছাড়া স্বামীর কাছে দু দণ্ড দাঁড়ালেও কেমন ভয় ভয় করে। পাছে কেউ দেখিয়া ফেলে।

সেই তো সেদিনই যখন বর এসেছে বর এসেছে—বলিয়া মেয়েরা সকলে জোড়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে সদরে ছুটিতেছে—উনি হঠাৎ আমার পিছনে আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে বাস। কী সাজ সেজেছ? কে কনে ভ্রম হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে—

বলিয়া একটু দুষ্টু হাসি হাসিয়া চিবুকটি ধরিলেন। আমার তো ভয়ে প্রাণ খাঁচাছাড়া।

যদি কেউ দেখিয়া থাকে?

আহা!

বলিয়া ছুটিয়া পালাইলাম।

অথচ মনের অগোচর তো চিন্তা নাই।

ওই আসমানিরঙা হালকা বেনারসি শাড়িখানি পরিয়া সাজা পর্যন্তই ইচ্ছা হইতেছিল উনি একবার দেখুন।





॥ ১৭ ॥

উঃ কী আলোই হয়েছিল বিয়েতে সেদিন।

একসঙ্গে অনেকগুলো অ্যাসিটিলিন গ্যাস বাতি চারিদিকে জ্বালিয়া দেওয়ায় যেন মনে লাগছিল দিনের বেলা!

যত আলো, তত সুগন্ধ সৌরভ, তত হাসি গল্প কথা!

একটা রাতের জন্য বাড়িটা যেন পরীর রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। সকলকেই সুন্দরী লাগিতেছিল।

তবে ওই সুন্দর ছবির মাঝখানে কিনা নাপিতের হেঁড়ে গলার কর্কশ ছড়ার রব!! সে একেবারে আকাশ ফাটানো।

ভাল মন্দ লোক থাকো তো সরে যাও!
আপন ভাল চাও তো—সরে যাও!
মন্দ চিন্তা করলে, মন্দ চোখে চাইলে—
এই আমার মতন হতে হবে।
স্বামী পুত্তুরের মাথা খাবে।
একমুঠো চাল ছমাস খাবে—
চক্ষে ছানি, পায়ে গোদ, আঙুলে—কুড়ি কিষ্ঠি হবে!

ইস! কী বিশ্রী! কী বিশ্রী।

এই চিৎকার শুনিয়া আসিতেছি তো জ্ঞানাবধি, তবে কী যে বলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। চিৎকারটাই মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ি ঠুকিয়াছে।…

এবারে কমলির বিবাহে, সব কিছু লক্ষ করা একটা রোগ হইয়াছে।

নাপিত মশাই বোধহয় আরও কিছু বলিতে উদ্যত ছিলেন, এই সময় শ্বশুর মহাশয় আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, অ বাবা পরামানিক। যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামা দাও!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্কশ কণ্ঠে যেন মধু ঝরিল।

শিব দুর্গার বে!
রাম সীতার বে।
চারি চক্ষের মিলন।
অন্তরীক্ষে দেবদেবী করেন দর্শন।
দেব দেবী করেন আশীর্বাদ—
শুভ কার্যে যেন কিছু না ঘটে প্রমাদ!
এই কন্যে বর!
সুখে শান্তিতে—হাজার বছর
করেন যেন ঘর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন উলুধ্বনি ওঠে।

উলুধ্বনিটা অনেকটা যেন লেকচারের সময় সকলের হাততালি দেওয়ার মতো। …ভাল কথা শুনিলেই সকলে হাততালি দিয়া ওঠে।

ইহাদের সকলের সঙ্গে একবার কোথায় যেন হিন্দুমেলা নামের একটি পরম সুন্দর জায়গায় গিয়াছিলাম। চক্রবেড়িয়ার বাড়ির আত্মীয়রা উৎসাহ দিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের গ্রামে মেলা দেখিয়াছি, মাঘমেলা।

সে অন্য রকম। যত রাজ্যের কুলো ডালা ঝুড়ি চুপড়ি মাটির খেলনা কাঠের পুতুল এই সব বিক্রি হয়। আবার গামছা কাপড়, গায়ের চাদর এও হয়।

শীতে হি হি করিতে করিতে বড়দের সঙ্গে সেই মেলায় ঘোরার মজার চাইতে যেন সাজাই বেশি মনে হইত।

মেলায় পাঁপর ভাজিতেছে ঘুগনি বানাইতেছে, সকল লোক কিনিয়া কিনিয়া খাইতেছে। কিন্তু আমাদের খাওয়ার উপায় ছিল না।

ওসব নাকি নোংরা। আর খারাপ তেলে ভাজা, খাইলে অসুখ করে।

মেজদি একদিন বলিয়াছিল, আচ্ছা ঠাকুরদা ! এত লোক খাচ্ছে, কই তাদের তো অসুখ করছে না ?

ঠাকুরদা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, হয় কিনা তুই জানিস ? বাড়ি গিয়ে কী হয়, না হয়, কেউ দেখতে গেছে ?

পাড়ার সকলেই যায় এবং খায়ও।

সেজদি তাহাদের কথা তুলিয়া বলিয়াছিল, কই ওদেরও তো দেখেছি। কই অসুখ করে ?

ঠাকুরদা বলিয়াছিলেন, সব শরীরে—সব সয় না রে। এ বাড়ির রক্ত আলাদা।

আর কে কী বলিবে ?

কিন্তু এই হিন্দুমেলা ? এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

মহিলারা মাথার ঘোমটাটি একটুখানি মাত্র পিন দিয়া মাথায় আটকাইয়া বেশ মুখ খোলা হইয়া স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছেন।

আবার নিজের দোকান পাতিয়া কী যেন সৌখিন খাবার বিক্রি করিতেছেন। এই সব।

সব কিছুই আশ্চর্য লাগিতেছে।

তো সেখানেই লেকচার শুনিয়াছিলাম। মহিলাদিগের সঙ্গে আলাদা একটি অংশে।

দেখিয়াছিলাম পুরুষ জনেরাও আছেন, তবে অন্যদিকে। আর মাঝে মাঝেই তাঁহাদের হাততালি শোনা যাইতেছে।

তো—

এখন এই বিয়ের অনুষ্ঠানে যখন তখন বিশেষ সময় ঘনঘন উলু বা শাঁখের ধ্বনির ব্যবস্থা দেখিয়া সেইটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

ওই স্ত্রী আচারের পরে কনেকে পিঁড়িতে বসাইয়া তো সম্প্রদান আসরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

সেখানেও পিঁড়ি ধরিতে সম্পর্ক বিচার।

কাকা মামা না হইয়া যায়।

আশ্চর্য। এত হাজার হাজার নিয়ম মনেও থাকে।

আবার মাঝে মাঝে দুজন প্রবলপ্রতাপ গিন্নিতে মতভেদও হইয়া থাকে। যেমন কমলার বিয়ের বাসরের বিছানা কোন মুখো হইবে, তাই লইয়া একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল দুইজন গিন্নির মধ্যে।

এঁরা অভ্যাগতা, আমি ভাল চিনি না।

শেষে কী হইল তা জানি না। কোনটা পূর্ব মুখ কোনটা উত্তর মুখ তাই গুলাইয়া গেল।

তা বাসরের বিছানা যা হইয়াছিল। যেন রাজারানীর মতো।

লাল মখমলের বালিশ তাকিয়া, সোনালি কাজ করা বেগুনি সিল্কের চাদর।

সত্যি—

এই একটি ব্যাপার। একদিনের জন্য ছেলেরা রাজপদ পায়, আর মেয়েরা মহারানীর।

বাসরের আমোদ ?

সে আর বলিয়া ফুরাইবে না রে ভাই—মনের কথা।

এক কড়ি খেলা লইয়াই কী হাসির হুল্লোড়।

বরকে গান গাওয়াইবার জন্য ঝুলোঝুলি।

তো খুব চালাক বর। তাই দিব্যি ওইসব বৌদি টৌদির সঙ্গে কথা চালাইল। বলিল, আগে আপনাদের মেয়েটি গান শোনাক, তারপর—আমার হবে!

হঠাৎ কনের দিদিমা থান ধুতিপরা মূর্তির উপর কাহার একখানা জমিদার বেনারসি ওড়না চাপাইয়া বলিলেন, অতো খোসামোদ কেন ? জানে না। তাই গাইছে না। ভয় পাচ্ছে পাড়ার ধোপার গাধারা গান শুনে গলা মেলাতে ছুটে আসে। গান শুনতে চাস তো—আমিই গেয়ে শোনাচ্ছি—শোন।

বলিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ওড়নার কোন ধরিয়া নাচের ভঙ্গিতে কোমর বাঁকাইয়া গাহিতে শুরু করিলেন।

কওনা কথা মুখ তুলে বৌ, চাওনা চেয়ে চোখ মেলে।…এনেছি বকুলমালা করবে আলা তেল চোঁয়ানো তোর চুলে! মিনি দাঁতের হাসিটি বেশ / মুখখানি বেশ টুলটুলে / কড়াইপানা সোনার দানা দুলছে দোদুল, তোর গলে। / কওনা কথা মুখ তুলে—সে কী নাচুনে ভঙ্গি!

বাসর সুদ্ধু মেয়েদের হাসির দাপটে ঘর ফাটে।

সদর হইতে কে যেন আসিয়া সাবধান করিয়া দিল, বরকর্তা এ বাড়িতে উপস্থিত আছেন! এত বাচালতা তাঁর কানে যায় না যেন।

একটুখানির জন্য সকলে সমঝাইল।

আবার যে কে সেই।

বাসরে কাহারও ঘুমানো চলিবে না, বাসরের আলো নিভানো চলিবে না। সারারাতটা করিবে কী এতগুলো মেয়ে? বাসর জাগিবে সংকল্প করিয়া যাহারা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছে।

তাছাড়া—একটি সম্পূর্ণ অচেনা আস্ত পুরুষ মানুষকে লইয়া এত মাখামাখি, এত বাচালতা করিবার সুযোগ আর কোথায়? বিনা দ্বিধায় তো

বরটির কান মুলিয়া দিলেন আমার সেজ জা।

শ্যালাজ সম্পর্ক। দারুণ ছাড়পত্র!

তা শেষ পর্যন্ত একটি ভাল গান গাহিল কনের দিদি বিমলা।

বিমলার যে এমন মিষ্ট গলা, ও এত ভাল গান গাহিতে পারে, তা কে জানিত?

গানটিও অতি অপূর্ব।

একেবারে আনকোরা নতুন। আগে কখনও শুনি নাই।

বারবার ফিরাইয়া গাওয়ার দরুন, প্রায় মুখস্থই হইয়া গিয়াছিল আমার। পরে একটি কাগজে টুকিয়া লইয়াছি—

অন্তর মধুময় প্রীত ভরা—
ওগো শরমে চারু আঁখি—
নত করা!
নববধূ পতি পাশে সেজেছে ভাল,
রয়েছে বাসর গৃহ করিয়া আলো।
আজি কী সুখের নিশি, আজি কী হাসিছে দিশি—
আজি কি মধুর সাজে সেজেছে ধরা!
তুমি একা ছিলে সখা, উদাস মনে—
মিলন হইল তব শুভ লগনে!
হোক শুভ এ মিলন
হোক মধু এ মিলন
হোক চির এ মিলন হৃদয় হরা!
এ মিলন সুকোমল এ মিলন নিরসন
এ মিলন বিধাতার সৃজন করা।···

গান শুনিয়া ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

আর বরও তার এই বড় শালিটিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইয়া আলাপ করিবার জন্য রীতিমত আগ্রহী হইয়া উঠিল। কনেও গুজগুজ সুরে কথা কহিতে লাগিল।

অন্যান্য জনেরা তখন হাই তুলিতে শুরু করিয়াছে। আর কত আমোদ করিবে? আমোদেরও ধকল কম নয়?

গোধূলি লগ্নে বিবাহ হইয়াছে। বাসরটি তো লম্বা!



॥ ১৮ ॥

তুলনা করাটা অমঙ্গল, তবু পরদিন সকালে কেবলই মনে হইয়াছিল, বাড়ির চেহারাটা যেন প্রতিমা বিসর্জনের পর পূজার দালান।

গত রাত্রে কত আলো কত হাসি গান উল্লাস উচ্ছ্বাস।

আর সকালে?

সব ঠাণ্ডা!

সানাইওয়ালারাও সকালে তেমনি করুণ সুর ধরিয়া বসিয়াছে। প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে।

বড় জ্যেঠিমা তাঁর অশক্ত শরীর লইয়াও গতরাত্রে কিছু ওঠাউঠি করিয়াছেন। আজ আর নড়িবার ক্ষমতা নাই।

আপন মনে বলিতেছেন, এই জন্যেই বলে, মেয়ের বিয়ে যেন দেওয়ালির রাত! এক রাত্তিরের রোশনাই।

কনে লইতে বরের বাড়ি হইতে বরের দাদা ও জামাইবাবু আসিয়াছিলেন।

সঙ্গে দুটি ছোট ছোট মেয়ে। সম্পর্কে ননদ। বেশ শান্ত ঠাণ্ডা লাজুক।

তবে এ বাড়িতে আমার জায়েরা ইচ্ছা করিয়া একটু অভব্যতা করিয়াছিলেন।

শেজ-তোলানির টাকা লইয়া কৌতুক করিতে করিতে—ব্যাপারটা তেতো করিয়া তুলিলেন।

বরের দাদা নিজে থেকেই পঁচিশ টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, মা দিয়ে পাঠিয়েছেন—শয্যা তোলানি না কী বলে।

ওমা জায়েরা বলিয়া উঠিলেন, এঃ। মাত্তর পঁচিশ টাকা? পঞ্চাশের কমে চলবে না।

তিনি যতই বলেন আমাকে যা বলে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কী করব?

এনারা ততই বলিতে থাকেন, কেন? আপনি এমন মাতব্বর বড় ভাই, পকেট গড়ের মাঠ করে এসেছেন? নিজের ট্যাঁক থেকে ছাড়ুন। তা নইলে রইল আপনার ভাই আর ভাই বৌ। ছাড়া হবে না। ও ভাই বর। দ্যাখো আমাদের দোষ দিও না। তোমার দাদা বন্ধকিমাল ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না।

বর বলিল, আচ্ছা ধার রইল। বলেন তা হ্যাণ্ডনোট কেটে দিয়ে যাচ্ছি।

এই সব মজার মজার ফালতু কথার কেবলই চাপান উতোর।

বাস। হঠাৎ বাতাস গরম হইয়া ওঠে।

বরের ভগিনীপতি বলিয়া ওঠেন, ও বাবা, শুনেছিলাম খুব বনেদি বংশ। এতো আচ্ছা বাড়ি। এত দর কষাকষি! এই আমার একটা আংটি বাধা রেখে, বন্ধকিমাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি। ওঠো হে ছোট শালা, বৌ নিয়ে গাড়িতে উঠবে এসো।

গলার স্বর বেশ মেজাজি!

তবু সেজজা নাছোড়বান্দা সুরে বলিলেন, ওমা! আংটি নিয়ে কি আমরা ধুয়ে তার জলটাকে ভাগ করে খাব? পঞ্চাশ জন এয়ো—

তাহলে—কেউ আমাদের সঙ্গে চলুন! সেখানে গিয়ে বিহিত হবে।

বলে গট গট করে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি তো লজ্জায় সারা।

অন্য সকল মেয়েরাই লজ্জা পাইতেছে বোঝা গেল।

বরের মুখ থমথমে।

এ যেন হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।

সেজজায়ের মতে এইরকমই না কি করিতে হয়। এই হচ্ছে মজা!

জানি না বাবা, অকারণ একটা তক্কাতক্কি করিয়া তিক্ততার সৃষ্টি।

এই মজার বিধান কি শাস্ত্রে লেখা আছে? ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই

কথা মনে হইতে থাকে, আসলে—অনাত্মীয় পুরুষের সহিত বাকচাতুরি করিতে পাইবার একটি ছাড়পত্র পাওয়ায় মাত্রা রাখিতে পারে না মেয়েরা।···

সকলেই অবশ্য নয়। সেজদির ধাঁচের মেয়েরা।

আমার তো ভাবনা ধরিয়া গেল বরের ভারি মুখ দেখিয়া।

তবে পরে—

বরকনে বিদায় পর্ব কালে সব মেঘ কাটিয়া গেল।

বাড়ি সুদ্ধ সকলের কান্না দেখিয়া, এবং কনের হাপুস নয়ন দেখিয়া, দেখিলাম সে বেচারিও বেনারসী জোড়-এর চাদরের খুটে চোখ মুছিতেছে।

এই কনে বিদায় কী দুঃখজনক। বিশেষ করিয়া কণকাঞ্জলি দেয়াটি!

অভিভাবকরা কোন প্রাণে মেয়ের হাতে এক থালা চাল দিয়া সেইটি মায়ের আঁচলে ঢালিয়া দেওয়ার সঙ্গে মেয়েকে দিয়া বলান, এতদিন যা খেয়েছি পরেছি সব শোধ দিয়ে গেলাম।

কী কুৎসিত, কী নিষ্ঠুর প্রথা।

সত্যিই আমাদের জীবনযাপনের প্রতি পদে পদে, কত যে নিষ্ঠুর নির্মম, কদর্য কুৎসিত প্রথা আছে!! ভাবিতে বসিলে প্রাণ শিহরিত হয়।···

এই বিদায় কালের সময় আমার স্বামীকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমার লজ্জা হইতেছিল। এ সময় কী এমন কাজকার্য পড়িল? লোকে কী মনে করিবে?

মানুষকে ঠিক পথে চালিত করতে—প্রধান সহায়ক তো—পাছে লোকে কিছু বলে!

আশ্চর্য!

ছেলেটি তো এঁদেরই। অথচ তাঁহার দোষ ত্রুটিতে আমার লজ্জা আসে কেন? এ এক রহস্য।

ভগবানের দয়ায় লজ্জা কাটিল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, নবুটা নিশ্চয় কোথাও সরে পড়েছে। সে তো দেখেছি এই কনে বিদেয়টা একেবারে সহ্য করতে পারে না। বেটা ছেলে হয়েও চোখ মোছে।

আমার এক ক্ষুদে ভাসুরঝি বলিয়া উঠিল রাঙাকাকার তো ওই কাণ্ড! ছাতে উঠে গিয়ে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাও তো নিজের বোন নয়। সাত জন্মে চোক্ষেও দেখা ছিল না।

এই কথাটাও এই সময় বড় কটু ঠেকিল! এত সুন্দর মেয়েটা, কথা বড় কটকটে।

ওমা! হঠাৎ দেখি উনি কখন ছাত থেকে নামিয়া আসিয়া কনের গাড়ির

দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে আসিল। কী রে কেঁদে কেঁদে মুখটাকে যে হুলো বেড়ালতুল্য করে তুলেছিস।

কত লোক কত কথা কহিতেছে। কানেও ঢুকিতেছে না। যেন সমবেত একটা স্বর মাত্র।…কিন্তু এই স্বরটি? কানে আসিবা মাত্র, প্রাণে ঢুকিয়া পড়িয়া সজাগ করিয়া দিল।

আবার শুনিতে পাইলাম, আরে বাবা, তোকে তো আর হাজার মাইল দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না কেউ!…এই তো এক মিলের রাস্তা। রানী শঙ্করী লেন, এ বাড়ি থেকে কতটুকুই বা? দেখিস্ রোজ রোজ গিয়ে হাজির হব!

এই সান্ত্বনার কথায় কমলা নতুন করিয়া প্রায় ডুকরাইয়া উঠিল। উনি বলিলেন, এই দ্যাখো! ছিচ কাঁদুনি মেয়ে!…সত্যি বলছিরে—যখন তখন যাব। কান্না থামা! কান্না থামা! ইস! মুখটা কী করলি?

আবার একটু থামিয়া, চেষ্টাকৃত, জোর হাসির সঙ্গে বলিলেন, যাব তো বলছি রোজ রোজ তখন আবার তোর এই বরটি না ভাবে—এ শালা এত ঘনঘন আসছে কী করতে? খুব সন্দেশ রসগোল্লা সাঁটছে বোধহয়!

এই রকমই তো স্বভাব ওঁর, বিষণ্ণতার ভারি হাওয়াকে কৌতুকের ধাক্কায় উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা।

নতুন বরটির মুখেও ভার ভাব কাটিয়া একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, ও দাদা। যাবেন। দু-বেলা চার-বেলা যাবেন। খুব এনজয় করা যাবে আপনার যাওয়াটা।

হাতটা বাড়াইয়া আমার স্বামীর একটি হাত চাপিয়া ধরিল!

বেশ ছেলেটি।



॥ ১৯ ॥

আজ বাড়ি খাঁ খাঁ।

যে যেখানের সে সেখানে চলিয়া গিয়াছে। মগরাহাটের শেষ মানুষটিও আজ চলিয়া গেলেন। যিনি হচ্ছেন দিদিমা। যিনি একাই একশো।

বিবাহের যাবতীয় মঙ্গল কর্ম—যেমন অষ্টমঙ্গলা জোড়ে আসা, সুবচনী সত্যনারায়ণ ইত্যাদি সারার পর সনৎদারাও মেয়ে লইয়া মগরাহাটে ফিরিয়া যাওয়ার পরও তিনি কলিকাতায় থাকিয়া কালী গঙ্গা দর্শন করিবার ইচ্ছায় দিন তিন চার থাকিয়া গিয়াছিলেন।

আজ সরকার মশাই তাঁকে রাখিতে গেলেন।

আজ আবার অফিস আদালতে কিসের যেন একটা ছুটি। অতএব—

সংসারেও অন্দরে যেন কেমন একটা ছুটি ছুটি ভাব। অলসতা, ক্লান্তি, এবং বিগত কিছুদিনের স্মৃতির আলোচনা চলিতেছে।

বলা বাহুল্য, নারী ধর্মে আলোচনা ক্রমশই সমালোচনার পথে প্রবাহিত হইতে থাকে। কাহারও সুখ্যাতি করিতে করিতেও বলা শুরু হয় তবে কিনা—

তবে একথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল, সনৎদার মতো

এমন ভদ্র মার্জিত আতিশয্যহীন, কৃতজ্ঞতায় গভীর মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।

সত্যই তিনি যে এক্ষেত্রে কতটা কৃতজ্ঞ তাহার গভীর প্রকাশ দেখা গিয়াছে, কিন্তু ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া অথবা ধন্যবাদ দিবার চেষ্টা করিয়া—প্রাপ্তিতে খাটো করিয়া ফেলেন নাই। এবং তাঁহার জ্যাঠামশাইয়ের গভীর স্নেহকে খেলো করিয়া তোলেন নাই যেন পিতাপুত্র সম্পর্ক!

ভাবটা যেন, পুত্র আবার পিতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে যাইবে কী?

আমার তো অন্ততঃ তাই মনে হইল।

কথা বলিয়াছেন খুবই কম।

তবে ফিরিবার দিন মেয়ের উদ্দেশে বলিলেন, তোর খুব ভাগ্যি যে তোর শ্বশুরবাড়ির ওরা মগরাহাটে গিয়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। তাই না এ ব্যবস্থা, একেবারে রাজকন্যের মতো! তোরই কপাল জোর। বাবা বেটার রেল কোয়ার্টারের বাসার ঘর থেকে ঠাকুরদার কাছে এসে রামরাজত্ব।

তারপর এক সময় আমার স্বামীর সহিত কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, নন্দীগ্রামের মুখুজ্যেবাড়ি যে কী জিনিস তা এতদিনে জানতে পেলাম, জ্যাঠামশাইকে দেখে।





॥ ২০ ॥

দীর্ঘদিন পরে আজ একটু সকাল সকাল রাত্রে শয়নঘরে আসা !

উনি হাসিয়া বলিলেন, কী গো এ অভাগাকে মনে আছে ? দেখো চিনতে পারো কি না।

আমিও গরিব না কি ? বলিলাম, চিনতে না পেরে অচেনা পুরুষের ঘরে এসে ঢুকে পড়েছি ভাবছ ?

উনি আমাকে নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া বলিলেন, আরে বাস ! কদিনে তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি ! ওই দিদিমাটির সঙ্গগুণে বুঝি ?

তা বলতেও পারো। কথার ফোয়ারা তবে সত্যি কী চমৎকার যে মানুষ ! দেখে দেখে কেবলই ভেবেছি—মানুষ স্বভাবগুণে অন্যের কাছে—আনন্দও হতে পারে। আবার আতঙ্কও হয়ে উঠতে পারে। অথচ সবাই সেটা বোঝে না। সবাই যদি সেটা বুঝত !

উনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, সবাই সেটা বুঝলে, সংসার জায়গাটা কি আর সংসার থাকত ? স্বর্গ হয়ে উঠত। তো যাক আমার দিব্যহাসিনীটি যে

সেটি বুঝেছে তাতেই আমি ধন্য। ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ।

তারপর ?

তারপর সারারাতি কি কথা ফুরাইয়াছিল? এই কদিনের তাঁহার অভিজ্ঞতার আর আমার অভিজ্ঞতার ফসলগুলি পরস্পরে আদান-প্রদান চলিল ?

কী সেই অভিজ্ঞতা ?

স্রেফ্ মনুষ্য চরিত্র পাঠের।

কত রকমই দেখা হইল। যাহাদের যা ভাবিতাম তাহারা যেন অন্যরকম।

রাত্রি যখন ভোর হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় জল দিবার শব্দ শুনিয়া চমক ভাঙিল।

উনি বলিয়া উঠিলেন, ইস! রাস্তায় জল দিতে বেরিয়েছে! রাতটা গেল কোথা দিয়ে ?

আমি বলিলাম! এ মা! তোমার একটুও ঘুম হল না।

গুলি মারো ঘুমকে।···ঘুম তো রোজ আছে।

আচ্ছা আমাদের বিয়ে হয়েছিল কোন মাসে ?

বাঃ মনে নেই ? সেও তো এই ফাল্গুন মাসেই, পনেরোই ফাল্গুন।

কত বছর হল ?

কাঁটায় কাঁটায় দশ বছর।

ওমা! কী কাণ্ড! উঠিয়া পড়িয়া উনি কি না আবার শুইয়া পড়িয়া আমাকে কাছে টানিয়া বলিলেন, ধ্যেৎ।· বাজে কথা! এই তো মাত্র কদিন আগে!

মাত্র কদিন আগে!

মাত্র কদিন আগে!

সারাটা দিন কথাটা যেন আকাশে বাতাসে উচ্চারিত হইতে থাকে। মনে হয় এ কী! এ যে আমারই মনের কথা! মাত্র কটাদিন। কোনও কারণে হিসাব করিতে বসিলেই মনে হয়। দ-শ-ব-ছ-র। কোথা দিয়া কাটিয়া গেল ?

ভাবিতে বসিলেই তো মনে হয়, কদিনই বা তেমন করিয়া কাছে পাইয়াছি! কটি কথাই বা কহিতে পাইয়াছি!

আমারই মনের কথার প্রতিধ্বনি ওঁর মুখে শুনিয়া যেন বিহ্বল হইয়া গিয়াছি। সারাটা দিন সেই বিহ্বলতার মাদকতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি।

উনি পুরুষ! বাহিরের জগতে কত কর্মকাণ্ড ওঁর, কত চিন্তা ভাবনা, সেই বৃহৎ জগৎটির মধ্যে আমার জায়গা কতটুকু থাকিবার কথা ?

অথচ উনিও কি না আমারই মতো—বলিলেন, এই তো মাত্র কদিন!

কী মুস্কিল। আহ্লাদ হইলেই আমার চোখে জল আসে কেন ?

সকলেরই কি এমন হয় ?

আচ্ছা ওই কমলারও কি দশ বছর পরে মনে হইবে কদিনই বা পাইলাম ?



॥ ২১ ॥

আঃ ! আজ সকাল থেকে এত টেলিফোন একটার কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার একটা।

প্রোমোটার কিশলয় চ্যাটার্জি'র আজকের অবস্থা যেন কোনও নেতা-টেতার মতো ! স্নান তো দূরের কথা, দাড়িটা পর্যন্ত কামানো হয়ে ওঠেনি।

অবশ্য পালিট বদলের মতোও চলছে।

অপর পারের লাইনটা নামিয়েই, নিজেই আবার তক্ষুণি ডায়াল করতে বসতে হচ্ছে। হঠাৎ ভারি গোলমেলে একটা আইন জারি করে বসেছে পুরদপ্তর এই প্রোমোটারদের ওপর।

একজনের ওপর জারি হলেই ধাক্কাটা তো গিয়ে পড়বে অনেক জনের ওপর। কাজেই কথা চালাচালির চাল চালাতে হচ্ছে।

শব্দভেদী বাণ তুল্য এই যন্ত্রটি যতটি প্রয়োজনীয়, সময় সময় ততটিই বিরক্তিকর। এই গোলমেলে জালের মধ্যে হঠাৎ এক নাছোড়বান্দা দালাল ঘণ্টা কাটিয়ে দিল প্রায়। ছাড়তে আর চায় না।

বহুবার আহা ! ঠিক আছে।···তাহলে ওই কথাই রইল।···রাখছি। নমস্কার। আচ্ছা···বলে বলে অবশেষে সবে রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়েছে,

কন্যে ফুলকি আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে ঘরে ঢুকে এসে ছুরিকাটা গলায় বলে ওঠে, আচ্ছা বাপি! তুমি কি আজ টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্সের জন্যে ফোনটা বুক করে রেখেছ? সকাল থেকে আঁকড়ে বসে আছ ওটাকে। উঃ.। আমার একেবারে মার্ডার কেস হয়ে গেল। কী দারুণ জরুরি একটা ফোন করার দরকার ছিল।

কিশলয় মেয়ের ঝঙ্কারে অপ্রতিভ ভাবে বলে, তা সেটা বলবি তো!

বলব? কখন বলব? একটা আলপিন গলাবার ফাঁক পাওয়া গেছে? কেবলই শুনে যাচ্ছি, সেই তো! আর বলবেন না। এ একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত।...আগে থেকে একটা নোটিশ পর্যন্ত না—আচমকা, এই দেখুন ব্যাপার। হ্যাঁ...আচ্ছা কী বলব বলুন! মুশ্কিল! দেখি পরে জানাচ্ছি। আমি? আমি তো মশাই অথই জলে পড়ে গেছি। আচ্ছা...রাখছি এখন...।

ওরে বাবা! তুই যে ডায়লগগুলো মুখস্থই করে ফেলেছিস।

কথা শেষ হতে না হতেই আবার ফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠল!

ওই! হল তো? যা দেখছি—হতভাগাটার সঙ্গে চির বিচ্ছেদ হয়ে যাবে!

ঠিকরে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে।

সুচেতার হাতে এখন আর দুকাঠির কাজ কারবার চলছে না। পশমের গোলাটাও গুটোচ্ছে। বলে উঠল, আচ্ছা ফুলকি, তোর কি কোনদিনই কথার ছিরিছাঁদ হবে না?...বাপের সঙ্গে কথা বলছিস, না ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিস বোঝা দায়!

ফুলকি ঘাড় বেঁকিয়ে অগ্রাহ্যের গলায় বলে, বোঝবার দায়িত্বটা তোমায় কে দিয়েছে?...কথার ছিরি ছাঁদ। নিজের কথার কী ছিরি!...ইয়ার! একটা সভ্যশব্দ জুটলো না?...তো বন্ধু নয়-বা কেন? চিরদিন বাবাই তো আমার সবচেয়ে বন্ধু! মন প্রাণে যত কথার উদয় হয় বাবার কাছেই তো তার উত্তর জানতে যাই।...আর এখনই কী এক বিজনেসে ঢুকে বাপিরও বারোটা বেজে গেল, আমারও শান্তি ঘুচল।

তা মনের কথা টথা মাকে বলা যায় না? বড় হয়েছ—সকল কথা বাপের কাছে কেন? মাকেই তো বলতে হয়।

মাকে!

এই একটিমাত্র স্বরক্ষেপেই মাকে একদম ধূলিসাৎ করে দিয়ে ফুলকি বলে ওঠে, আমি একটু বেরোচ্ছি।

কী? এই অসময়ে আবার বেরোচ্ছিস? মানে কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

ওঃ। মা! আমার একটু বেরোনোর পক্ষে কোন সময়টা তোমার কাছে সুসময় বলতে পার?

আমার তো সবই ভুল। কটা বেজেছে দেখেছিস?

দেখেছি বলেই তো তাড়াতাড়ি করছি। আর পাঁচ মিনিট দেরি করলে, যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটে যাবে! চললাম!

যাবার আগেই—

কিশলয় এ ঘরে চলে এসে বলল, যা বাবা! এবার তুই যত ইচ্ছে, ফোন করগে। লোকটাকে বলে দিলাম, দারুণ দরকার এক্ষুণি বেরোতে হচ্ছে। পরে আবার ফোন করবেন!

আমার দরকার নেই! তোমার বিজনেসের চেয়ে তো আর তুচ্ছ আমার কাজটা বড় নয়।

এই দ্যাখো! রাজকন্যের রাগ হয়ে গেল? কী বলব রে। যা একখানা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। রোজ রোজ নতুন নতুন আইন জারি হচ্ছে। মরুক লোকে। আমাদের মাননীয় পুরদপ্তরের নতুন হুকুম, ফ্ল্যাটে লিফটের ব্যবস্থা না করতে পারলে পাঁচতলার বেশি উঁচু করা চলবে না। এতে একশো রকম ঝামেলা হয়ে গেল।···এখন সকলেরই মাথায় হাত।

ফুলকি বলল, তা আইনটা কী অন্যায় বাবা? প্রাণের দায়ে লোকে ছ'তলার ফ্ল্যাট নেবে আর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হার্ট ফেল করে প্রাণটা খোওয়াবে! এটাই ভাল?

তো আগে থেকে সে সব বলবে তো? পাঁচতলার ছাত ঢালাই হবার পর, হঠাৎ হুকুমটি এল!

ফুলকি বলে ওঠে, ওঃ হুকুম এল। তা সেটাকে মানানোই হবে, এমন কোনও হুকুম জারি হয়েছে?

হয়নি। হতে কতক্ষণ?

ফুলকি হেসে লুটিয়ে পড়ে বলে, ততক্ষণে তো তোমাদের সাততলা উঠে যাবে বাবা! সেটা ভেঙে দেবার হুমকি দেওয়া হতে হতে আটতলা উঠে যাবে! ডোণ্ট ওয়ারি পিতৃদেব! চালিয়ে যাও!

সুচেতা বলে ওঠে, আচ্ছা তোমার এই মেয়েটার সব কিছুকে অগ্রাহ্য করবার প্রবণতা কেন? আর এত সাহসই বা আসে কোথা থেকে?

সাহস আসে সব কিছুর মধ্যে ফাঁকির কারবার আবিষ্কার করে মা! যাক গে, ওতেতো আমাদের কারও কিছু এসে যাবে না। মনের আনন্দে সুখে আহ্লাদে জীবন তো দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ···যাক গে চলি—!

সেই চলি? একবার যদি জেদ চাপল তো আর সেটি মাথা থেকে নড়বে না।

কিশলয় বলল নড়বে না যখন জানো তখন আর নড়ানোর চেষ্টা বৃথা। যাকগে—ঘুরে আয় একটু। বেশি দেরি হবে না তো?

ফুলকি যেতে গিয়েও বসে পড়ে বলে। আড্ডায় গিয়ে বসে পড়লে সেটা হবে কিনা বলা যায় না বাপি। যাকগে—! গেলাম না! তোমাকেই জিগ্যেস

করি কথাটা। আচ্ছা বাপি? একশো বছর আগে—ভাবলে তোমার মনে হয় না দারুণ একটা অন্ধকার যুগ! হয় না? একশো—বছর আগে। অথচ—

কী অথচ রে?

অথচ দেখছি একশো বছর আগেও দিব্যি জলজ্যান্ত আস্ত আস্ত সব মানুষ সংসারে ঘোরাফেরা করছে। এমন কি রীতিমত আধুনিক আধুনিকও। অন্ধকারের ছায়া মাত্র নেই।

একশো বছর আগের ওই দিব্যি জলজ্যান্তদের তুই পাচ্ছিস কোথায় রে ফুলকি?

কেন এই তোমার মনোহরপুকুরের মুখুয্যে বাড়ির দিব্যহাসিনী দেবীর দিনলিপি থেকে!

কী সর্বনাশ! এখনও সেটাকে রেখে দিয়েছিস?

সুচেতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, রেখে দিয়েছে মানে? সেটাকে নিয়েই তো পড়ে আছে রাতদিন। কোথায় কোথায় নাকি পোকা ধরে খাবলা করেছে, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে লাগিয়ে লাগিয়ে তার পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আন্দাজে আন্দাজে হারানো অক্ষরদের খাড়া করা হচ্ছে। ধ্যান জ্ঞান হয়েছে মেয়ের এখন ওই খাতা! ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছে মেয়ের!

ফুলকি হঠাৎ গভীর গলায় বলে, মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয় মা। মনে হয়—পূর্বজন্মে কি কোনও বিগত জন্মে আমিই ওই দিব্যহাসিনী দেবী ছিলাম না তো? নাহলে ওর কাহিনী আমায় এত টানে কেন? তার মানে ওর ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছে।

সুচেতা রেগে আগুন হয়ে বলে, বাঃ চমৎকার! খুব উন্নতি হচ্ছে তো? এই তোমার—সায়েন্স পড়া মেয়ের কথা শুনলে? পূর্ব জন্ম বিগত জন্ম ভূত, ভূতের টান! ···ছি ছি ফুলকি এই সব মানিস তুই?

ও মা! শুধু আমি? কে না মানছে আজকাল? তা তোমাদের বাল্যকালে বোধহয় ওই মানামানিটা একটু উঠে গিয়েছিল! মাঝে মঝে এমন হয়তো। যেমন তোমাদের আমলে নাকে নোলক পায়ে নূপুর, মাথায় চূড়ো খোঁপা, মেহেঁদি পাতায়—হাত রাঙানোর ফ্যাসান উঠে গেছিল, তেমনি—ওরাও ফিরে আসছে। ···বাংলা সাহিত্য তো পড়ো না। জানো খালি উলের গোলা গোলা মাথাদের যা হয় আর কী। ···অন্তত বাংলা শারদ সাহিত্য পড়লে দেখতে পেতে, ওরা সবাই এসে গেছে। পূর্বজন্ম পরজন্ম জন্ম জন্মান্তর ছায়া মায়া কায়াহীনের কায়ারা! সব! এমন কি দেখতে পেতে কোনও বুড়ি ভূত তিন প্রজন্ম ধরে জিইয়ে জিইয়ে—গহনার বাক্স আগলে বেড়াচ্ছে, আসল ওয়ারিশানের হাতে তুলে দেবার জন্য। কোনও মেয়ে হয়তো—সাতজন্ম আগের সতীনের ওপর প্রতিহিংসে মেটাতে—ওই সাত সাত জন্ম তার ধারে কাছে

জম্মাচ্ছে—আবার সতীন হতে, কিম্বা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে।···কেউ কঁচি বাচ্চা ছেলে রেখে সরে যাওয়ায় সেই ছেলেটা বুড়ো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, তাকে আগলে বেড়াচ্ছে।···পুরুষ ভূতেরা হয়তো দুবার জন্ম ধরে কোনও এক হারানো প্রেমিকার পিছন পিছন ধাওয়া করে চলেছে।···চলছে এসব গো মা। ···তো এসব না থাকলে আবার সমাজে ফিরে আসে? সমাজে না এলে সাহিত্যে আসবে কোন সাহসে? লেখা হচ্ছে তো তাদের কথা? পাঠকে তো শুনি—এসব খুব খাচ্ছেও।···তো এই সব মহা মহারথী লেখকরা কেউ সায়েন্স পড়েননি? আমি কোন ছার। সত্যি বলতে মা, আমি ক্রমশই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি—হয়তো বা আমিই একশো বছর আগে ওই মহিলাটিই ছিলাম। তা না হলে, তার সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে যাই কেন মাঝে মাঝে! তার মানসিকতা আর মতবাদের সঙ্গে নিজের মতবাদ আর মানসিকতার এত মিল খুঁজে পাই কেন?··অথচ—একশো বছর আগে ভাবতে গেলে তো—ভির্মি খেতে যাবার জোগাড় হয়।

সুচেতা চোখ কুঁচকে বলে, কী খাবার জোগাড়?

বললাম তো—ভির্মি। মানে আর কি ফেণ্ট হয়ে যাবার—

এ কথা আবার শিখলি কোথায়? সাতজন্মে তো আমাদের বাড়িতে এমন অদ্ভুত সব কথা বলা হয় না।

শিখলাম কোথায়? বোধহয় ওই দিব্যহাসিনীর দিনলিপি থেকেই। কত নতুন নতুন সব শব্দ যে পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা মা জানো, কাকে বলে ভাতঘর আর কাকে বলে কাঠঘর। হি হি হি।

সুচেতা ভীতুচোখে স্বামীর দিকে তাকায়। বলে, দেখছো—কী সব আবোল তাবোল বকছে। আমি বলছি মেয়েকে একটা ডাক্তার দেখাও।

ডাক্তার?

কিশলয় হো হো করে হেসে ফেলে, বলে ওঠে, এক্ষেত্রে তো তাহলে ডাক্তার না ডেকে ওঝা ডাকানো উচিত। ·· ওঃ। কী নার্ভাস তুমি! ···মেয়ে তোমার ঘাবড়ে দেবার জন্য যা মুখে আসছে, বলছে, আর তুমি তাতে ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছো?···আচ্ছা ফুলকি! তুই তো তোর মাকে জানিস বাবা! তবে অমন ভয় দেখাস কেন? শেষকালে—ওর জন্যেই না ডাক্তার ডাকতে হয়।···

তুমি হেসে ওড়াচ্ছ বাপি? ··ভাবছ আমি মার সঙ্গে ঠাট্টা করছি? মোটেই না। তোমাকেই বা কী বলব? তুমিও তো তেমনি। একেই তো সাত জন্মে গল্পের বইয়ে হাতও দাও না। এখন তো আবার বিজনেস মাথায় ঢুকিয়ে আরও হিজবিজবিজ হয়ে গেছ।···সেই যে কী যেন বলে—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে না কী, তাই হচ্ছে গো বাপি!

দিন পাল্টাচ্ছে তার মধ্যে মানুষের স্বভাব, বিশ্বাস চিন্তা চেতনা সব

পাল্টাচ্ছে। আচ্ছা—তোমার মনে আছে বাপী? আমি যখন খুব ছোট্ট দাদু আমায় গল্প বলতেন—তখন একদিন···

ও বাবা! সেই কথা তোর মনে আছে? বাবা তো মারাই গেছেন, তুই যখন নেহাত ছোট। তো হঠাৎ সে কথা? তার সঙ্গে এখনকার প্রসঙ্গের কী?

বলছি! মনে আছে কেন জানো বাপি? সেদিন মার কাছে বকুনি খেয়ে দাদুর খুব মনে দুঃখু হয়েছিল কিনা। তাই আর কোনওদিন গল্প বলেনি দাদু!

সুচেতার চোখে আবার ভয়ের ছায়া। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিশলয়ের দিকে তাকায়। ভাবটা হচ্ছে—দ্যাখো! আমি বলিনি, ওর হেডঅফিসে কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে!

তবু কিশলয় ইসারা করে, বলতে দাও। কিন্তু সুচেতা ধৈর্য ধরতে পারে না। তীক্ষ্ন হয়, কী অ্যাবসার্ড কথা বলে চলেছিস? আমি তোর দাদুকে বকুনি দিতাম?

দিতে না? দিতেই তো! লজেন্স দেবেন না বাবা! যখন তখন বিস্কুট দেবেন না বাবা। কতদিন বলেছি আপনার মুড়ির বাটি থেকে ওকে মুড়ি দেবেন না বাবা! ওতো তেল নুন মাখা। দাদু ভয় পেয়ে যেত। বলত একটু-খানিতে কী হবে? তাও তুমি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতে।···এদিকে তুমি বেরলেই চুপি চুপি দাদুর কাছে চাইতাম ওইসব। বেচারি দাদুর কী অবস্থা হত, এখন তাই ভাবি!

সুচেতা আগুন জ্বলা চোখে বলে ওঠে, বেশ! দেখা যাচ্ছে আমি খুব খারাপ। তো হঠাৎ এসব কথা উঠছে কেন এতদিন পরে?

বলছিলামই তো? তো বলতে দিচ্ছো কই? জানো বাপি, এতদিন দাদু একটা ভূতের গল্প বলছিল, মা রেগে-মেগে আমায় হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে এনে আঙুল তুলে তুলে তোমার বাবাকে বলল, আর কক্ষনও ভূতের গল্প বলবেন না বলে দিচ্ছি। বাচ্চাদের ভূতের গল্প বললে, তারা ভীতু হয়ে যায়। এটুকু বুদ্ধি নেই আপনার? তাই দাদু কেঁদে ফেলে আমায় বলেছিল আর কখনও গল্প বলব না। ···কিন্তু এখন? বাপি গো! এখন বাচ্চাদের বইয়ের বাজার দেখছ? দেখবে কী? বইমেলায় গিয়েছ একদিনও? গেলে দেখতে—এখন বাচ্চাদের জন্যে শুধু ভূত আর ভূত।···বস্তা বস্তা ভূত বাক্স বাক্স ভূত ব্যাগ ভর্তি বোঝাই ভূত। আবার বাসুন ভূত, মামদো ভূত, সাহেব ভূত, জাপানি ভূত, জলার ভূত, জঙ্গলের ভূত, হানাবাড়ির ভূত, ভাঙা গাড়ির ভূত, রেল কামরার ভূত, কয়লাখনির ভূত। ভূত রাজ্য তো বিশাল। কাজেই যে কোনও জায়গাতেই হোক—নির্জন আর অন্ধকার অন্ধকার গা

ছমছমে, যে রকম অবস্থাতে পড়া যাক, তার জন্যে ঠিক জায়গা বুঝে ভূতেরা মজুত থাকে।···তাছাড়া—শুধুই কি মানুষ ভূত? গোভূত, ঘোড়া ভূত, কুকুর ভূত, কালো বেড়ালের ভূত কত কি!

তো মায়েরা তো সব সেই সব ভূত কাহিনীতো বেছে বেছে ছেলে মেয়েদের জন্যে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাবা গাদা গাদা টাকা খরচা করে। কই কেউ তো ভাবছে না, পড়ে বাচ্চারা ভীতু হয়ে যাবে! অথচ বেচারা দাদু—

মুখটা একটু ফিরিয়ে ফের বলে আসলে—ভূত আর ভগবান এই দুজন শক্ত ব্যক্তিকে কিছুতেই মনিষ্যি হৃদয় থেকে তাড়ানো যাবে না। যতই উঠে পড়ে চেষ্টা করা হোক, বিদেয় করে ফেলেছি বলে নিশ্চিন্দি হওয়া যাক। ঠিকই আবার ঘুরে ফিরে কোনফাঁকে সুড়ুৎ করে এসে ঢুকে পড়বে। ওনারা—চিরকালের। ওনারা অজর অমর অক্ষয়। আর ওঁদের সাঙ্গো পাঙ্গো হচ্ছে—স্বর্গ নরক, পূর্বজন্ম পরজন্ম। আসলে এই কথাটাই বলতে চাইছি—বাবা তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু। আমি তো তাই ঠিক করে ফেলেছি, ওইসব পূর্বজন্ম পরজন্ম সমস্ত মানব! এবার থেকে।

ওঃ। একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। সুচেতা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলে, গুরুজনকে আর কত ডাউন করবি ফুলকি? এটাই বুঝি তোদের এ যুগের ফ্যাশন?

ফুলকি মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের এ যুগেরই কি মা?

এটা তো ঠিক আনকোরা নতুন নয়। ভেবে দেখল তোমাদের যুগেই বোধহয় এর পথিকৃৎ। কই দিব্যহাসিনীদের যুগে তো দেখছি না এ ফ্যাশন!

ওঃ। অসহ্য! নিকুচি করেছে তোর দিব্যহাসিনী! ওই লক্ষ্মীছাড়া খাতাখানাকে এক্ষুণি টান মেরে গ্যাস স্টোভের আগুনে ফেলে দিচ্ছি গিয়ে।

শুনে ফুলকি শিউরে ওঠার ভঙ্গিতে বলে ওঠে ইস! বললে কী মা? এ যে প্রায় গৃহবধূ হত্যার সামিল! বেচারি একশো বছর ধরে কোথাও কোনওখানে কোনও একটু লুকনো জায়গায় ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে, নিজেকে টিকিয়ে রেখে এসেছে। আর তুমি কিনা অনায়াসে বললে—পুড়িয়ে মারবে! ওঃ। ভাগ্যিস তোমার ছেলে হয়নি মা, শুধু এই এক বাজে মাল মেয়ে! ছেলে থাকলেই তো বৌয়ের শাশুড়ি হতে। আর তখন কী হত তা কে জানে! তোমরাই তো বল, এই বেড়ালই বনে গেলে—

সুচেতা ঠিকরে উঠে ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলে যায় যা একখানি নিধিকে সৃষ্টি করেছি, পুড়ে মরার নিয়তি—বোধহয় আমারই কপালে আছে।

কিশলয় হতাশ ভাবে বলে, তোর জন্যে আমি কী করব ফুলকি? কেন মানুষটাকে অমন রাগিয়ে দিস বাবা? রাগের মাথায় সত্যিই যদি কখন কিছু করে বসে?

নো ভয় বাপি! মায়ের এখনও তোমার পুলওভারটা বোনা শেষ হয়নি। ওটা শেষ না করে কি আর—ফুলকি হাসতে হাসতে ইসরায়, বাপকে আশ্বাস দিয়ে বলে যায়, এই যাচ্ছি আমি অভিমান ভাঙাতে! রাগটাগ জল হয়ে যাবে।

মেয়েটার এত সাহস আসে কোথা থেকে? মাকে প্রচণ্ড ভালবাসে বলে?

মেয়েটা তা বাপের কাছে একটা ধাঁধা!





॥ ২২ ॥

(দিব্যহাসিনীর সেই খাতা ফুলকির মায়ের হাতে পড়েনি। কাজেই এখনও পর্যন্ত সেটি টিকেই আছে। ফুলকির ড্রয়ারের মধ্যে অনেক কাগজপত্রের নিচেয় আত্মগোপন করে আছে।···অতএব পাতা উল্টোলেই দেখতে পাওয়া যাবে খেয়াল মাফিক কখন কী লিখে রেখে গেছে সে।···সাল তারিখের বালাইটা অবশ্য ঠিক মতো নেই, থাকলে ভাল হত। আবার যদি-বা কোনও সময় লিখেছে গুছিয়ে, তো ভাগ্যক্রমে হয়তো সেই খানটাই পোকাদের কাছে সুখাদ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।···তবে কখনও ব্যতিক্রমও আছে। যেমন একজায়গায়—পোকাও কাটেনি, সাল তারিখও পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি তিথিও।)

আজ বঙ্গাব্দ তেরশো দুই, পয়লা চৈত্র, দোল পূর্ণিমা।···আজ এক পরম আনন্দের দিন! এখন অবশ্য দিনটা পার হইয়া রাত্রির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জানোই তো ভাই মনের কথা, এমনিতেই দোলের দিনটি খুবই আমোদ আহ্লাদে কাটে তার উপর আজ আবার একটি অভাবিত আহ্লাদের

ব্যাপার ঘটিল · কোন খবর না দিয়া সহসা সকাল বোধহয় নটা সাড়ে নটা নাগাদ, বড়দি আসিয়া হাজির।

দেখিয়া সকলের যেন ভাব আকাশ হইতে চাঁদ নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বড়দি নামটি তো যেন বাড়ি হইতে প্রায় উপিয়া যাইতে বসিয়াছিল! সেই পদে পদে বড়দির জন্য অভাব বোধের শূন্যতা বোধও বিলীন হইতে বসিয়াছিল! সেই বড়দি! দিব্য সুস্থ সহজ, আগের মতোই প্রাণবন্ত, কিনা বিনা নোটিশে একেবারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাড়িতে আহ্লাদের হাট বসিয়া যাইবে না?

তার আবার সোনায় সোহাগা, আজ দোলের ছুটি উপলক্ষে সকলেই বাড়িতে!

হ্যাঁ বেলা নাগাদ নটা সাড়ে নটা! বাড়ির সকলে গৃহবিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণের ঘরে প্রণাম সারিয়া এবং বিগ্রহদের চরণে আবির কুঙ্কুম ফাগ দিয়া, একে একে গুরুজনদের পায়ে দিতেছে। অতঃপর কারা খেলার হুল্লোড় শুরু করিবে। ...তাই পুরনো চাকর শশধর সিঁড়ির তলার ঘরে বালতি ভর্তি করিয়া রং গুলিতেছে, এবং রাশিকৃত পিচকারি বাহির করিয়া পাশে একটি বড় বার-কোষের উপর ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে।

এগুলি সবই পিতলের। কয় দিন আগে বাহির করিয়া মাজা হইয়াছে তাই সোনার মতো ঝকঝক করিতেছে। দুই একটি রুপারও রহিয়াছে। আগের কর্তাদের দরুন বোধহয়। আগের কর্তারা নাকি কেউ কেউ বিশেষ শৌখিন ছিলেন। তার চিহ্ন স্বরূপ রুপোর গড়গড়া, রুপোর পানের ডিবে, বাসনের সিন্ধুকে তোলা আছে দেখিয়াছি।

আমার শ্বশুর মহাশয়কে বর্মা চুরুট খাইতে দেখি। খুড়শ্বশুর বা ভাসুরদের না কি কারও কারও সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে, তবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহিরে বাহিরেই খান। বাড়ির মধ্যে তো চলে না, সর্বদাই কাছে পিঠে গুরুজন।

এই যে শ্বশুর ঠাকুর, তিনিও তো বড় জ্যাঠাইমার কাছে আসিবার আগে হাতের চুরুট নিভাইয়া, ফেলিয়া দিয়া আসেন।

সে কথা থাক, বড়দির আসার কথাই লিখি ভাই মনের কথা। এক কথা হইতে আর এক কথায় যাওয়া আমার এক রোগ!

তো হঠাৎ দেখিলাম, হরিপদর মা আর হরিপদ বার বাড়ির দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া শশধরকে কী বলিল। শশধর অ্যাঁ বলিয়া সেই রংমাখা হাতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

তৎপরেই সারা বাড়িতে রব উঠিল, বড়দি এয়েচেন? বড়দি এয়েচেন।...

বড় পিসিমা এয়েচেন। বড়পিসিমা— ···ওমা বড় ঠাকুরঝি !···আরে টুনি !

অতি বিহ্বল এই সম্ভাষণ শ্বশুর মশাইয়ের টুনি ! আগে একটা খবর দিসনি কেন মা ? স্টেশনে গাড়ি যেত—

তা গাড়ি তো আছেই তিনখানা ! বড় জুড়িগাড়িটা তো সব সময় সকলের সব দরকারে। মেয়েমানুষরা যখন যেখানে যায়, গঙ্গাস্নানে কী দেব মন্দিরেই হোক, বা নেমন্তন্ন বাড়িতেই হোক, এই জুড়িটা ঠিক চার চাকায় খাড়া !

টমটমখানা তো শ্বশুর মশাই কোর্টে যাবার সময় বেরোয়। সেই সঙ্গে তাঁর ছোট পুত্রটিও বাবার সঙ্গী হন। কারণ যাবার জায়গাটি তো দুজনেরই একই। কোর্ট।

ফিটনখানা অবশ্য বেশি দিনের নয়। মেজ খুড়শ্বশুর সম্প্রতি ওটি কিনিয়াছেন। তবে প্রয়োজনে অন্যের ব্যবহারেও কি আর লাগে না ?

কাজেই বড়দির হঠাৎ আসিয়া পড়ার আহ্লাদের চাইতে যেন বেশি আক্ষেপ দেখা গেল খবর না দিয়া আসায়।

বড়দি যতই হাসিয়া হাসিয়া বলেন, তাতে হয়েছেটা কী বাপু ? পায়ে হেঁটে হেঁটে তো আর আসিনি ? হাওড়া ইস্টিশানে কি ভাড়া গাড়ির অভাব আছে ?···তবে হ্যাঁ—যা ভিড় ? থার্ডো কেলাশ ছ্যাকড়া গাড়ি ছাড়া জুটল না একটা ! ওর তো জানলার পাখিগুলো ওঠে না। সব সাঁটা ! প্রাণ হাঁপু হাঁপু !

অতঃপর কত কথা। কত কত লোক কত কাণ্ড ! পাড়ার ছেলেরাও ফাগ আবির লইয়া আসিয়া হাজির।

বছরের মধ্যে মাত্র দুদিন তো ছেলে ছোকরাদের এই মুখুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশের অবাধ অধিকার।

বিজয়া দশমীর রাত্রে আর এই দোলের দিন সকালে।···আজ তো আবার হৈ-হুল্লোড়ে সকালটা দুপুরে গিয়া পেঁছাইয়া ছিল !

দুই দিনই প্রায় একই দৃশ্য প্রণাম, আশীর্বাদ আর হাতে হাতে রেকাবি ভর্তি মিষ্টান্ন দেওয়া ! জল সরবরাহের ভার বিন্দুর !

তবে খাবারের রকমফের হয়। বিজয়া দশমীর রাত্রে প্রধানত নারকেলের মিষ্টান্ন, চন্দরপুলি ক্ষির নারকেলের সন্দেশ, নারকেল ভক্তি, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি। তাহার সঙ্গে জিভে গজা তিলের চাক্তি, আর চমচম ক্ষিরমোহন।

দোলের দিন রেকাবিতে প্রধানত তো গুড়ের মুড়কি, ফুটকড়াই, চিনির ফুটকড়াই, চিনির মুড়কি আর অবশ্যই একখানি করিয়া চিনির মঠ। ···এছাড়াও নানাবিধ শুকনো মিষ্টি। অত হৈ-চৈয়ের মধ্যে হাতে হাতে দেওয়া তাই রসের মিষ্টি দেওয়া হয় না তেমন। ঘর দালানের মেজেয় রস ছড়াছড়ির ভয়ের জন্য বোধহয়। কে জানে কী জন্য। তবে বছর বছর ওই একই

তালিকা। এই না কি এঁদের চিরদিনের কুলপ্রথা।

এই দুইটি দিনের মধ্যে আরও সাদৃশ্য এই বিজয়ার রাতেও যেমন সকলকে প্রণাম নিবেদন, আর বালক বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ পর্বের বিশাল চাপের মধ্যে প্রাণটি পড়িয়া থাকে। একটি বিশেষ প্রিয় চরণে প্রণাম নিবেদনের নিভৃত অবসরের প্রতীক্ষায়, তেমনি দোলের দিনও।

কখন সেই চরণ দুটির কাছাকাছি পেঁছিনো যাইবে। তবে বিজয়ার প্রণামে রাত্রিটার আশ্বাস আছে। সেটি তো কেউ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

দোলের দিনের আবির কুঙ্কুম ফাগের জন্য তো রাত্রির আশ্বাস নাই। নেহাতই যে দিনের বেলা।

তবু ওরই মধ্যে—একটু লুকাইয়া চুরাইয়া—বাড়িতে অনেক চোরা দালান, চোর কুঠুরি আধা সিঁড়ি ইত্যাদি গলি ঘুঁজির গোলক ধাঁধা আছে ভিতর বাড়ির দিকে, তাই সুযোগ জুটিয়া যায়।

এবারে বড়দি আসিয়া পড়ায়, বেশ খানিকটা এলোমেলো হইয়া যাওয়ায় আমি যতটা না হোক, তিনি দিব্যি সুযোগটি লইলেন। মুখ একেবারে লাল করিয়া ছাড়িলেন। আঁচলটাই খতম হইল মুছিয়া মুছিয়া।

তা দেবর সম্পর্করাও দিন বুঝিয়া কম সুযোগ নেয় না। এদিন তাহাদের কেউ শাসন করিতে পারিবে না। যেমন কারও বাসর ঘরে মহিলাদের অবাধ ছাড়পত্র জোটে। দ্যাওর সম্পর্করা তো লড়ালড়ি করিতে করিতে প্রায় জড়াজড়ি।···কী অস্বস্তি!

ভাবিয়া অবাক হই। লজ্জা শরমের এত কড়াকড়ি, এত হুঁশিয়ারি, কোথাও যেন কোনও বেচাল না হয়! অথচ হঠাৎ হঠাৎ এক একটা দিনকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়পত্র দেওয়ার প্রথা কেন?

এ যেন বজ্র আঁটুনিতে হঠাৎ একটা গেরো ফসকা।

এর কারণ কী?

ভাই মনের কথা, এমন উল্টো পাল্টা দেখিয়া আমার অদ্ভুত একটা তুলনা মনে আসে ওই যে যেমন স্কট থমসনের সোডা ওয়াটারের বোতলটি খুলিবার আগে হঠাৎ ধাক্কা না মারিয়া আগে ঈষৎ ধাক্কায় চাপ দিয়া মুখটি কিছুটা আলগা করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে ভিতরের গ্যাসটা কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া যায়।···এটি না করিলে না কি ওই গলাটেপা গড়নের বোতলের গলার কাছে যে কাচের গুলিটি আটকানো থাকে। সেটি হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া বার হইয়া কোথায় না কোথায় গিয়া পড়িয়া বিপদ বাধাইবে।···এও যেন অনেকটা তাই। মানুষের মধ্যে যে চাপা একটা বন্যতা আর বর্বরতার গ্যাস থাকে। সেটিকে ঝাঁজ কমাইতে এক আধটা ঘুলঘুলি রাখা।

এ অবশ্য আমার ধারণা। তো আমার ধারণা শুনিলে অন্যরা হাসে এই

মুস্কিল। আলোচনা করিয়া যাচাই হয় না, আমার ধারণার সঙ্গে আর কারও মিল আছে কিনা!

স্বামীর কাছে বলিতে লজ্জা করে। লজ্জা না করিলে, আলোচনা করিয়া দেখিতাম!…

তবে ওঁর সঙ্গে বড়দির ব্যাপারে অনেক আলোচনা হইল। সেটি প্রকৃতপক্ষে ওঁরই তোলা প্রসঙ্গের ফলে!

মজা এই—যে বড়দি গুরুদেবের মহিমা কীর্তনে একেবারে বিভোর হইতেন, মনে হইত, গুরুদেব না স্বয়ং ভগবান, তাঁহার সম্পর্কে আর তেমন উচ্চবাচ্য নাই। তবে দলবল লইয়া তিনিই না কি কলিকাতায় আসিয়াছেন দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে। কোনখানে নাকি গৌরাঙ্গ মন্দির তৈয়ার করাইতেছেন। এই সুযোগে কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়া বড়দি যেন বাড়িতে আসিবার সুযোগে বাঁচিলেন!

তবে মনে হয় সহজে ছাড়া পান নাই। কারণ শুনিতে পাইতেছিলাম ভাইদের কাছে বলিতেছেন। সহজে কি ছাড়া পাইরে ভাই? বাঘা এক গুরুভাই আছেন, তিনিই হর্তা কর্তা বিধাতা। সক্কলের নাকের সামনে ছড়ি ঘোরান। আমায় বলেন কী, এভাবে ইস্টিশান থেকে তোমাকে দল ছাড়া হয়ে যেতে দেওয়া তো চলবে না দিদি। সকলে একসঙ্গে মঠে গিয়ে ওঠা হোক তারপর বাবা যা আদেশ দেন। আমি জোর দিয়ে বললাম, বাবার আদেশ আমার নেওয়া আছে। তবু ঘ্যানঘ্যানানি, সঙ্গে মাত্র একটা ছেলেকে নিচ্ছেন, তাও তো নেহাত বাচ্চা—

আমি বললাম, আরে দাদা আমি হচ্ছি কলকাতার মেয়ে। সাত সকালে হাওড়া ইস্টিশান থেকে আমার কে কী করবে? গাড়োয়ানটা খুব ভাল। বলল, মনোহর পুকুর? ও তো আমার জানা জায়গা আছে।

তারপর আরও মজা এখন বড়দির মুখে শোনা গেল, গুরু আশ্রম না কি সংসারের অধম। গুরুভাই বোনেরা, অনেক জনই স্বার্থপর। ভেতরে ভেতরে রেষারেষি, বাবার কাছে সুয়ো হবার চেষ্টায়, এ ওর নামে ও এর নামে লাগালাগি বাবাটিও নাকি এক চোখো। আর তাঁকে যে যা বোঝায়, তাই বোঝেন!

শেষমেষ বলিলেন, এ নির্মল আনন্দের আশায় যাওয়া, তাই যদি না জোটে, সেই সংসারের কূটকাচালিই দেখতে হয়, তবে আর বাপ ভাইয়ের মনে কষ্ট দিয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া কেন?

বড়দি আসায় শ্বশুর মশাই যেন আবার ছেলেমানুষের মতো হইয়া টুনি টুনি করিয়া খুব ব্যস্ত হইলেন, যেমন হইয়াছিলেন কমলার বিয়ের আয়োজনের প্রথমটায়।…কেবল? খোঁজ নিতেছেন, টুনির খাওয়া হয়েছে কিনা, যা যা

দরকার হাতের কাছে পেয়েছে কিনা। ওর ঘর ঠিকঠাক সাজানো আছে কিনা—

সবাই তো তটস্থ।

তারপর বড়দি নিজেই যখন তাড়া দিলেন, ব্যাপার কী বাবা ? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন ? এসেছেটা কে ? আপনার টুনি না কুটুম্ব ? এমন করলে আমার তো তিষ্ঠনো দায় হবে।

শ্বশুর ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলিলেন, না রে না। অনেকদিন ছিলিস না তো ! সব ঠিকঠাক আছে কিনা তাই ভাবনা হচ্ছিল। এবার তোর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বাঁচব। আর চলে যাবি না তো বাবা ?

বড়দি সতেজে বলিলেন, নাঃ !

ওই একটি শব্দতেই শ্বশুর মশাই যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

তবে সংসারের তলায় তলায় যেমন সব কিছুতেই দেখিতে পাই দু' রকম ধারা বয়। বড়দি আসায় কেউ কেউ খুবই আহ্লাদিত, আর চলিয়া যাওয়ার মন নাই শুনিয়া যেন কৃত কৃতার্থ।

যেন বড়দিই তাহাদের পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরের ছাদ।...

আবার কেউ কেউ 'মুখে বাঁচলাম বাবা' বলিলেও—বেশ যেন হতাশ হইয়াছেন। যেন তাঁর গদিটা বেশ দখলে আসিয়াছিল, আবার হাতছাড়া হইয়া যাইবে নিশ্চয়।

বড়দির যা প্রভাব।

কিন্তু ভাবিয়া পাই না। ওই রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর পুজোর ঘর ইত্যাদির খবরদারি করিতে পাওয়ার মধ্যে এত কী সুখ ? তাহার জন্য এত রাজনীতির কলা-কৌশল কেন ?

কী আছে ওই হলুদ লঙ্কা পাঁচফোড়ন চাল ডালের ওপর কর্তৃত্ব করার মধ্যে ? ভাবিয়া পাই না।

আমার তো মনে হয়, পরিবার পরিজন সকলে ভালমত খাইতে পরিতে পাইলে, আর ঠিকঠাক সময়ে যত্ন সেবাটি পাইলে, এবং সংসারের সকলে সুস্থ থাকিলেই তো, সর্বদাই হাসি আনন্দে কাটানো যায় !

বাড়িতে এতগুলো কাজ করিবার লোক নিজেরা মেয়েরাও তো অনেকে। একটা সংসারকে নিপুণভাবে চালাইবার পক্ষে তো যথেষ্ট। আর সেইটি চলিলেই তো হইয়া গেল। সংসার জীবনে সেইটাই তো কাম্য। সর্বদা সুখে আনন্দে থাকা।...কিন্তু কেন যে মানুষ ইচ্ছা করিয়া দুঃখ অশান্তি ডাকিয়া আনে।

সকলে সকলকে ভালবাসার চোখে দেখিলেই তো সকল সমস্যা মিটিয়া যায়।

মানুষ কেন যে এই সহজ হিসাবটা মনে রাখে না।

মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনও মন্ত্র বলে, আমার মনটাকে, অন্য সকলের মনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া যায় না! সকলেই তাহা হইলে সোজা হিসাবের পথে চলিয়া শান্তি সুখ অর্জন করিতে পারে!

ঈশ্বরের অগাধ কৃপা, এ সংসারে তো দৈন্য দারিদ্র্য নাই। তাহাতে অনেক কষ্ট তাহা ছেলেবেলায় গ্রামের লোকদের দেখিয়া বুঝিতাম।

অভাবের জ্বালায় তাহাদের স্বভাব নষ্ট হইতে বসিত।

কিন্তু যেখানে অভাব নাই?

সেখানে কেন এত সমস্যা? কেন, স্বভাব তার সৌন্দর্য হারায়? ভাবিয়া পাই না। দৈন্য দারিদ্র্যটি কি তাহা হইলে মনে?

ভগবান। তোমার কী অসীম অনন্ত দয়া যে, এ বাড়ির নবীন কিশোর নামের মানুষটির হৃদয়খানি ঐশ্বর্যে ভরা!

দিব্যহাসিনী! তোর কত ভাগ্য, ভাব সে কথা!

তো অহরহই তো ভাবি। সেই ভাবনাটিই তো আমার স্বর্গ সুখ!





॥ ২৩ ॥

আজ উনি রাত্রে সকলের সহিত খাইতে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আজ দেখে এলাম কমলিকে। যা গিন্নিবান্নি হয়েছে।

ইতিমধ্যে বড়দি কমলির বিবাহ পর্বের সকল ঘটনাই শুনিয়াছেন! তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই তো কদিন বিয়ে হল। এর মধ্যে আবার গিন্নিবান্নি হল কী করে? খুব পাকা পক্কান্ন মেয়ে বুঝি?

উনি বলিলেন, আরে না না। শুনলাম, ভীষণ না কি কাজের মেয়ে। শাশুড়িকে কিছু খাটতে দেয় না। সব কিছু যেচে যেচে করে। শাশুড়ি তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর বরটি? একদম বিগলিত! যেন কি নিধি পেয়েছে। শুনেও সুখ! বলিয়া সেজ খুড়ি বেজার মুখে উঠিয়া গেলেন।

উনি কেন বিরক্ত হইলেন, বুঝিলাম না।

আবার পরে শুনিলাম, আমার মেজ জাকে বলিতেছেন, প্রথম প্রথম সুখ্যাতি কিনতে অমন সবাই ভালমি দেখাতে পারে। বছর ঘুরুক, মাথার মধ্যে দিয়ে ষড় ঋতু বয়ে যাক, তখন সত্যি গুণটি বোঝা যাবে। এই তো এখানে কদিন ছিল। কুটোটিও তো ভাঙতে দেখিনি।

আশ্চর্য! একটা ছোট্ট মেয়ে! সবে পরের ঘরে গিয়ে পড়েছে। তাদের মন

রাখতে—মনোরঞ্জন করতে হয়তো প্রাণপাত করবার চেষ্টা করছে।…তার প্রতিও এমন বিরূপতা কেন? আসলে, ওই মানুষটি কারও সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারেন না শুনলেই যেন গায়ে জ্বালা ধরে। ভিমরুল কামড়ানোর মতো। চিড়বিড়িয়ে ওঠেন। আর কারও নিন্দে শুনিলে? সে যদি নেহাত অচেনাও হয়, তো সাগ্রহে শুনিতে বসেন, এবং মন্তব্য করিতে ছাড়েন না।

মানুষ যে কত রকমেরই হয়!

আমার এক জা বলিলেন, তো কমলি কি এখন থেকেই শ্বশুরঘর করবে? মা বাপের কাছে যাবে না?

উনি বলিলেন, শুনলাম যেন জামাইষষ্ঠীর সময় মেয়ে জামাইকে নিয়ে যাবেন বাবা। তা শাশুড়ি তো এখন থেকেই হা হুতাশ করছেন। বৌমা চলে গেলে কী করে দিন কাটাব গো।

সব নাটক!

বলিয়া জা মুখ বাঁকাইলেন।

আমার মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটিতে থাকে। কেন? কেন? এর মধ্যে নাটকটা কী?

তবে কি আমি এতই বোকা যে সংসারের কিছুই বুঝি না?

আরও কিছুক্ষণ কমলি প্রসঙ্গ চলিল—শ্বশুরের ভাত খাইয়া রোগা হইয়া গিয়াছে, না বিয়ের জল গায়ে পড়িয়া—মোটা হইয়াছে। কমলির শাশুড়ি কুটুমের ছেলেকে কেমন আপ্যায়ন করিল। কী খাওয়াইল, ইত্যাদি।

রাত্রে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মেজদি সব নাটক বলিলেন কেন!

স্বামী বলিলেন, ও তোমার মাথায় ঢুকবে না। ঢোকাবার দরকারও নেই। ভাল কথা হোক। আচ্ছা—আমি যে তোমায় সেই একটা বাহারি খাতা উপহার দিলাম, সেটায় তো কই লিখতে দেখি না। কেবলই তো এই চোতা কাগজের খাতাখানা ভরিয়ে তুলছ দেখছি।

এমা। সেটা তুমি দ্যাখো? যা তা হিজিবিজি লিখি। উনি বলিলেন কী লিখছ তা দেখি না। তবে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, পাতাগুলো ভরে উঠছে। আমার উপহারটা মাঠে মারা গেল তাহলে?

বলিলাম, আহা। তা আর নয়? সে খাতায় আমি ভাল ভাল গান তুলে রাখি।

তাই না কি? দেখি তো তোমার ভালর নমুনা একটা!

আমি 'না না ও দেখতে হবে না' বলিয়াও দেখাইলাম। না দেখাইলে কী জানি কী ভাবিবেন। হয়তো মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।

প্রথম পাতাটা খুলিয়াই বলিলেন, সত্যি তোমার হাতের লেখাটি বড়

সুন্দর ! একেই বোধহয় বলে মুক্তোর মতন অক্ষর। আমার তো দেখে হিংসে হয়।

এমন প্রশংসায় কার না লজ্জা হয় ?

বলিলাম, ও তো বেশি ধরে ধরে লেখা ! অত ভাল খাতা !

খাতার থেকে খাতার মালিক আরও ভাল।

উনি একটু হাসিয়া বলিলেন, অন্যের লেখা গান ? না নিজেই লিখেছ ?

আমি তো হাসিয়া মরি।

তা আর নয় ! এ তো রবিঠাকুরের গান। পড়ে বুঝতে পারলে না ?

পড়লাম কই ? হাতের লেখা দেখেই তো মোহিত। কই পড়ো তো শুনি।

আমার শোবার ঘরটি দালানের একটেরে, পাশেই আর কাহারও ঘর নাই, তাই সুবিধা। একটু গলা খুলিয়া কথা বলা যায়। তা পড়িলাম। (আমার বিশেষ প্রিয় গানটিই তো তুলিয়া রাখিয়াছি।) যদিও গলা নামাইয়াই পড়ি—

সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত, অন্তরে আমার।

যখন পড়িয়া শেষ হইল—
ছিঁড়ি মরমের শত বন্ধন,
তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন,
নন্দন উপহার !

উনি কেমন গভীর গলায় বলিলেন, তুমি এ সবের মানে বুঝতে পারো ?

আমি ছেলেমানুষী জেদের মতো বলিয়া ফেলি কেন পারব না ? এ তো আমারই মনের কথা।

তোমারই মনের কথা ! তুমি যে ক্রমেই আমায় তাজ্জব করে দিচ্ছ গো ! বিয়ের সময় শুনেছিলাম বটে বৌ পড়তে লিখতে জানে। কিন্তু ঠিক এরকমটি ভাবিনি। গল্পের বইটই অবশ্য পড়ো দেদার। তো সে এ বাড়িতে অনেক মেয়ে বৌ-ই পড়ে। কিন্তু ঠিক এমনটি নয় তারা। তাছাড়া সত্যি বলতে, তুমি তো গ্রামের দিকের মেয়ে ! সে সব দিকে মেয়েদের লেখাপড়াটাই নাকি দোষের শুনি।

শুনিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না, আমার পুরনো দুঃখ উথলাইয়া উঠিল। বলিলাম ঠিকই শুনেছ, জানো আমার মেজদির এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, খুব নাকি ভাল পাত্র। অবস্থা ভাল, ছেলে বিদ্বান তো মেয়ে দেখিবার সময় ঠাকুরদা বেশ উৎসাহ করে বলেছেন, এমনি ঘর সংসারের কাজটাজ সবই পারে, তাছাড়া লেখাপড়াতেও খুব মন। ঘরে বসেও যা

শিখেছে, ওর বয়সের ছেলেগুলো স্কুলে গিয়েও তা পারে না—ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে বরের জ্যাঠার মুখ গম্ভীর। বলে উঠলেন, মাপ করবেন মশাই। এখানে বিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা মুখ্যুসুখ্যু বৌ-ই চাই। বিদুষী বৌয়ে দরকার নেই। বৌকে তো আর অফিস কাছারি করতে পাঠাব না। হল না সেখানে বিয়ে। তো সেই জন্যেই বোধহয় ঠাকুরদা ভয়ে ভয়ে তোমাদের এখানে, আমার গুণের ব্যাখ্যা করতে সাহস পাননি। তোমরা যে এত ভাল, তা কী করে জানবেন ? পরে মেজদির যা বিয়ে হল। ভাবলে—প্রাণ কাঁদে ! সবাই যদি তোমাদের মতো হত !

উনি হাসিয়া বলিলেন, আরে ব্যস্ ! আমরা তাহলে খুব ভাল ?

বলিলাম, ভালই তো ! সবচেয়ে ভাল এই—লোকটি। বলিয়া তাহার বুকের উপর একটি আঙুল ঠেকাইলাম।

উনি উৎফুল্ল হাসির সঙ্গে বলিলেন, আর আমার মতে সব থেকে ভাল, এই এটি, বলিয়া আমার মাথাটি একটু নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, গানটা না কি তোমারই মনের কথা। তো বলো তো সুন্দর হৃদিরঞ্জনটি কে ?

আমার কেমন আবেশ আসিয়া যায়। হঠাৎ লাজলজ্জার মাথা খাইয়া, ওঁকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া বলিয়া উঠিলাম—তুমি ! তুমি ! তুমি।

সঙ্গে সঙ্গে টান টান করিয়া সুরে বাঁধা বীণাটির তার ছিঁড়িয়া পড়িল। যেন বীণা হইতে একটি আর্তনাদ উঠিল।

দরজায় দ্রুত ধাক্কা পড়িল, নবু নবু। দোরটা খোল্ একটু।

বড়দির গলা !



॥ ২৪ ॥

তো সেই রাত্রে কি শুধুই বড়দির ননদ ঘরের দরজাটা একটু খুলিয়াছিল মাত্র? সারা বাড়ির সদর অন্দর দেউটির গেট হইতে ছাদের সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত হাটপাট হইয়া খুলিয়া যায় নাই।

সারা পাড়ায় পড়শিদের বাড়িগুলোর পর্যন্ত সব জানলা দরজা খুলিয়া যায় নাই?

দুপুর রাতে সকল বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বালিয়া ওঠে নাই?···আর এই বাড়িতে! যেখানে বিনামেঘে হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা বজ্রাঘাতে সব কিছু অন্ধকার হইয়া গেল? সেখানে তো সব ঘর আলোয় আলোময়!

যে যেখানে ছিল, সকলেই হাহাকার করিতে করিতে একটি ঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতে—আলো জ্বালিয়া লইয়াছে!

সকাল হইতে না হইতে, বাড়ির দরজায় আরও লোক। লোকে লোকারণ্য একেবারে। যে খবর পাইয়াছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

আত্মীয় স্বজনদের নিকটও খবর পেঁছানো হইয়া যাওয়ায় তাঁহারাও

অনেকে আসিয়া পড়িয়াছেন। খবর তো দিতেই হইবে।

জুড়ি গাড়িটা সকল আত্মীয়জনের বাড়ি যায়। তাই সেই গাড়ির পুরনো কোচম্যান কপাল চাপড়াইতে, আর পাগড়ির আগা দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কর্তব্য কর্ম করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

বড়দি রাত্রে সেই যা একবার দরজা খোলার জন্য কথা বলিয়াছিলেন, তারপর মাত্র একটি বার বলিতে শুনিলাম, এই দেখতে এলাম আমি!

তারপর হইতে একদম যায় না।

অপরদিকে—অশ্রুজলের স্রোত কে না কাঁদিছে?

বড় জ্যাঠাইমা অশক্ত অপটু শরীরখানাকে নিয়া বারবার বলিতেছিলেন, ওরে আমায় একবার ওঘরে নিয়ে যা। কেউ তেমন কান দেয় নাই।

এক সময় দেখা গেল, তিনি কোনও মতে নিজেকে প্রায় হ্যাঁচড়াইতে হ্যাঁচড়াইতে এঘরে আসিয়া পড়িয়া ভিড় ঠেলিয়া সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও ছোট ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে বেইমানি করে তুমিও চলে গেলে? ন বছর বয়সে তোমাদের এ সংসারে এসেছিলাম তুমিই যে ছিলে আমার খেলা ঘরের খেলার সাথি।

কিন্তু কাহাকে বলিলেন?

তিনি কি তখন শুনিতে পাওয়ার জগতে রহিয়াছেন?

গত রাত্রে সেই সাড়ে বারোটার সময় দেহখানাকে অটুট অবিকল পালঙ্কের উপর ফেলিয়া রাখিয়া কোন ঊর্ধ্বলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

এর নাম না কি হার্ট ফেল।

তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে অবাক লাগিতেছে। সেই ধবধবে ধুতিটি পরা তাহার উপর ধবধবে সেরজাইটি।

ঝালর দেওয়া ওয়াড়ে ঢাকা বালিশের উপর মাথাটি রাখা। পাশে মোটা পাশবালিশ। পায়ের নিচেয় তাকিয়া।

এতটুকু এদিক ওদিক হয় নাই।

এইভাবে মৃত্যু হইতে পারে মানুষের?

আমার ঠাকুরদারও এমনি হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছিল। তো সে শুনিয়া ছিলাম নাকি সন্ন্যাস রোগ হইয়াছিল।

তবু সে একটা রোগ তো বটে।

কিন্তু আমার শ্বশুর মশায়ের এ কী হইল! গত রাত্রে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিলেন। পানের লবঙ্গটি পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিতে ভোলেন নাই।

হার্ট ফেল কী একটা রোগ?

জানি না কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

সেই ঘরের এককোণে দেয়ালে ঠেকিয়া, মাটিতে বসিয়া আছি, একটা মাটির পুতুলের মতো। নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই। কথা বলার তো নয়ই।

নিজেকে যেন ভয়ানক অপরাধিনী মনে হইতেছে। যেন আমারই জন্য এই অঘটন।

কেন? তাও জানি না! সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমি অন্য ঘরে হাসি গল্প করিতেছিলাম বলিয়া? চোখের সামনে কত কীই ঘটিয়া যাইতেছে, সাড় নাই।

অনেকের সঙ্গে হয়তো স্বামীও মৃতের পালঙ্কের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। আলাদা করিয়া দেখিতে পাইতেছি না।

অথচ জগৎ সংসার প্রকৃতি সকলে আপন আপন কাজ করিয়া চলিতেছে।

ভোর সকালের স্নিগ্ধ বাতাস কখন চড়া রোদে পরিণত হইয়াছে।···যিনি চিরদিনের জন্য সমস্ত অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাথার কাছের জানলার পর্দাটি টানিয়া দেওয়া হইল, মুখে রোদের আভাস লাগায়।

মাথার কাছে দুইজন দুদিকে বসিয়া অবিরত হাতপাখা নাড়িয়া যাইতেছেন।

আমার কোনও কাজ করিতে হাত পা উঠিতেছে না কেন? উচিত অনুচিত বোধ কর্তব্য অকর্তব্য বোধ সব হারাইয়া গেল কেন?

পাখা হাতে বসা কি আমারও উচিত ছিল না?

কিন্তু নিজেকে নড়াইবার ক্ষমতা না থাকিলে?

পারিবারিক বিধি নিষেধে শ্বশুর ভাসুরের সহিত কথা বলা চলে না। আমিও তো সেই নিয়মই মানিয়া চলিয়াছি, তবু কেন মনে হইতেছে, আমার অনেকখানি শূন্য হইয়া গেল। ইনি যেন আমার চিরদিনের কথার সঙ্গী ঠাকুরদার জায়গায় ছিলেন। এখনও বাবার সঙ্গে দূরত্বর দরুন যে ফাঁকা ভাবটি ছিল, তাহারও পরিপূরক ছিলেন!

জানি না কেমন করিয়া এমন একটি শ্রদ্ধা ভালবাসা আর একাত্মতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল ওই বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে?

আমারও এক একবার ইচ্ছা হইতেছে—ওঁর ছেলেমেয়েদের মতো আমিও বাবা! বাবাগো—বলিয়া পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়ি।



॥ ২৫ ॥

কতদিন পরে আবার এই খাতার কাছে আসিয়া বসিয়াছি।

কিন্তু ভাবিয়া পাইতেছি না, কেন বসিয়াছি। লেখার কী আছে এখন আর?

এতদিন কি ভোজবাজি দেখিতে ছিলাম? এতদিনের শক্ত গাঁথুনি পাথরের দুর্গটি তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়াইয়া এমন ভাঙিয়া পড়িল কেবল মাত্র একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুতে।

এই মৃত্যুটি কি একটি ব্যক্তির মাত্রের? না কি একটি বিশাল ব্যক্তিত্বের?

আপাত দৃশ্যে তো সংসারটা এখনও তেমনই চলিতেছে। অথচ মনে হইতেছে যেন অচল হইয়া গিয়াছে!

মনোহরপুকুরের মুখুয্যে বাড়ির কর্তার উপযুক্তই শ্রাদ্ধ শান্তি তো হইয়াছিল।

চিরদিনের—

পুরোহিত যা যা নির্দেশ দিয়াছেন সবই মানা হইয়াছিল দেখিয়াছি।

ষোড়শ দান, বৃষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণ বিদায় একশো ব্রাহ্মণকে ছত্র পাদুকা গীতা ও পিতলের ঘড়া দান করা হইল। কোন যেন বৈষ্ণব মন্দির হইতে বৈষ্ণব

ডাকিয়া আনিয়া কীর্তন গান হইল। তাঁহাদের মাথুর পালা গানে বহিরাগত মাত্র পরিচিতজনও কাঁদিয়া ভাসাইলেন।

লোক খাইল বিস্তর।

তিন চার দিন ধরিয়া চলিল সেই ভোজন পর্ব। ব্রাহ্মণ ভোজন আত্মীয় কুটুম্বদিগের জলপান নিয়ম ভঙ্গ নানা নামে। অতঃপর কাঙালি ভোজন।

মৃতের পাঁচ পাঁচটি ভাগ্যহীন পুত্র যখন মুণ্ডিত মস্তকে সারি দিয়া বসিয়া ষোড়শদান করিলেন, সকলে পরলোকগতের ভাগ্য সম্পর্কে ধন্য ধন্য করিলেন।

সেই সঙ্গে তাঁহার মহৎ হৃদয়ের উদারতা ও স্নেহপ্রবণতার প্রশংসা।

এমন মানুষ হয় না।

মৃত্যুর পর কিছুটা বাড়তি প্রশংসা দেখি সকলের ভাগ্যেই জোটে। নেহাৎ গুণহীন জনেরও।

হয়তো এমন কথাও বলতে শোনা যায়। আর যাই হোক, লোকটা এ বিষয়ে—

ইত্যাদি।

কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় সম্পর্কে সকলেই উদ্বেলিত।

অথচ—

অথচ এক অভাবিত অবস্থার উদ্ভব দেখিতে পাওয়া গেল।

ওই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খুড়শ্বশুরদের এবং ভাসুরদের মধ্যে কী মতবিরোধ, কী তর্কাতর্কি?

খরচ খরচ করিয়া কত কথা! কারও মতে যেন সবই বাহুল্য। আবার কারও মতে এটা দরকার। মৃতের প্রতি ভালবাসাবশত যতটা না হোক, নিজেদের সম্মান বজায় রাখিতে।

এই নিয়া বাদ বিতণ্ডার অবধি থাকে নাই। সব কথা লিখিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

সহসা মনে হইতেছে—যেন একটা ভিতরে ফাঁসিয়া যাওয়া তুলো বাহির হওয়া বালিশের ওয়াড়টা খুলিয়া পড়িয়াছে। একটা ছোবড়া বাহির হইয়া যাওয়া গদির উপর একখানি কাশ্মীরি শাল বিছানো ছিল, সেটা হঠাৎ ঝড়ের বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ হঠাৎ মনটা কেমন ক্লিষ্ট হইয়া যায়।

মনে হয় এ বাড়িতে এত আব্রুর কড়াকড়ি। কিন্তু মনের কোনও আব্রু নাই? তাই মনটা এমন বেআব্রু ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে যখন তখন।

আমার স্বামীরও যেন প্রকৃতিতে একটা বদল আসিয়া গেছে। সর্বদাই যেন রুক্ষ ক্লিষ্ট বিষণ্ণ।

প্রথম দিনই রুক্ষতা দেখিয়াছিলাম। যখন শ্মশান যাত্রাকালে বলাবলি

হইতে লাগিল, মুখাগ্নিটা তো তাহলে নবুকেই করতে হয়।

উনি শুনিয়া তীব্র রুক্ষ গলায় বলিয়া উঠিলেন, তার মানে? দাদা থাকিতে আমি?

তারপর চুপি চুপি ঘোষণা—নাকি দাদার পক্ষে বাধা আছে। বড়দার নাকি সন্তান-সম্ভাবনা!

আর সেক্ষেত্রে দাদার শ্মশানে যাওয়া চলে না। কাজেই জ্যেষ্ঠর বদলে কনিষ্ঠ।

স্বামী আরও রুক্ষ তিক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, চমৎকার! আর সময় পেলেন না!

অতঃপর করিয়াছেন সবই, কিন্তু সবই যেন অশান্তভাবে।

পরে একদিন বড়দির কাছে হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন, দ্যাখো বড়দি, বরাবর মনে একটা সান্ত্বনা ছিল, ওই ভয়ংকর কাজটা আমায় করতে হবে না। অথচ—সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেলেন সেখান হইতে।





॥ ২৬ ॥

কিন্তু বড়দিই কি আর বেশিদিন রহিলেন ?

বাবাহীন এ সংসারে আর টিকতে পারছি না বলিয়া একদিন এতকাল পর সেই ত্যাগ করিয়া আসা শ্বশুরবাড়িতে চলিয়া গেলেন।

তাহারও বাবার কাজ-এর সময় আসা যাওয়ার ফলে, আবার নত হইয়া—ডাকাডাকি করিতেছিল।

মেয়ে মহলে কথার স্রোত বয়, ওরা বোধহয় ভাবছে—বাবা, চিরদুঃখী মেয়ের নামে, কিছু বিষয় সম্পত্তি লিখে দিয়ে রেখেছিলেন। তাই এখন ঢল নামল।

আমার স্বামী বড়দিকে বলিয়াছিলেন, বাবা বিহীন বাড়িতে, আমাদেরও তো থাকতে হচ্ছে বড়দি।

বড়দি বলিলেন, তোদের কথা আলাদা। তোদের নিজেদের ঘরবাড়ি সংসার। আমি তো একটা পরগাছা মাত্র।

তারপর দোনামোনা করিয়া বলিয়াছিলেন, আর এখানে মান-সম্মান বজায়

রেখে বাস করা যাবে নারে নবু। সংসারে ঘুণ ধরেছে। ভাঙন লেগেছে। ভেতরে বাইরে ভাঙন ধরেছে।

তার থেকে তোমার সেই গুরু আশ্রমেও তো ভাল ছিল। সেই ভুলে যাওয়া শ্বশুরবাড়িতে—এতদিন পরে—

গুরু আশ্রম!

বড়দির মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সেখানেও রসদের ঘাটতি ঘটলে আর মানসম্মান নেইরে। বাবা চলে গেলেন, আর কে আমায় মোটা হাত খরচ দিয়ে দিয়ে ওখানে দাসি শিষ্য করে রাখবে? এ হল গিয়ে যতই হোক শ্বশুরবাড়ি। সেখানে উঠোন ঝাঁট দিতে বললেও, মান সম্মান যায় না!

একেই না কি বলে আপন আপন জীবন দর্শন।

বড়দির আদরের ভাইটি তো তাই বললেন, যারা যা জীবন দর্শন। এক সময় বড়দির মনে হয়েছিল, যেখানে স্বামী দুর্ব্যবহারকারী সেখানে আবার পড়ে থাকব কোন সুখে? এখন হয়তো একটা ভুল স্বপ্ন দেখছেন। ভাবছেন হয়তো লোকটা বদলে গেছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় নাই। মনে হইয়াছিল, বাবা তখন মেয়েকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যতক্ষণ আমি আছি, এখানে তোর দুটো ভাতের অভাব হবে না।

সেই ভাতটা অবশ্যই সম্মানের আর আদরের ছিল। কিন্তু বাবা চলিয়া যাওয়ায় ভাতটা ঠিক মতো বজায় থাকিলেও আদর সম্মানটি লোপ পাওয়ার সঙ্কেত পাইতেছেন।···

সংসারটির তো এখন আর একটিমাত্র একচ্ছত্র কর্তা রহিল না। অনেক কর্তা। কাজেই নানা রকমের চাষ চলিতে শুরু করিয়াছে।

এইজন্যই কি বলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট!

একটি নৌকোয়ই একটি শক্ত মাঝি হাল ধরিয়া থাকিলে, নৌকো ঠিক পথে চলে, কিন্তু গণ্ডা কতক মাঝি উঠিয়া বসিয়া হালখানা হাতে লইবার জন্য টানাটানি করিতে শুরু করিলে সে নৌকো বানচাল হইবে না?

সকলেই প্রাধান্য চায়, প্রভুত্ব চায়, সর্বেসর্বা কর্তা হইয়া বসিতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়াটি তো সফল হইবার নয়। সকলে তাঁহাকে মানিবে কেন?

অথচ যিনি ছিলেন?

সর্বময় কর্তাই তো ছিলেন।

সকলেই তো মানিয়া চলিত! কিন্তু নিজে কি তিনি এমন অশোভন ভাবে সর্বময় কর্তৃত্ব চাহিতেন?

তিনিই তো ছিলেন সকলের চাইতে নম্র! অপরের মতামত সম্পর্কে

শ্রদ্ধাশীল। তা সে শুধু গুরুজনদিগ সম্পর্কেই নয়, লঘুজন সম্পর্কেও।

এমনকি (শুনিতে অবিশ্বাস্য) একদিন দেখিয়াছিলাম হরিপদর মার আট বছরের ছেলেটা হরিপদও কোনও একটি কথা বলিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন, বলছিস ? আচ্ছা তবে তাই করি।

একদিন ছেলেটা বলিয়াছিল, ও দাদু, তোমাদের তো কত আতর এছেন্‌ছ্‌, খোসবুর ছড়াছড়ি। তোমার ওই টমটোম গাড়িখানার মধ্যে তাই একটু ছড়িয়ে রেকোনা গো। ভেতরটায় কেমন ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ ছাড়ে।

শুনিয়া তো সকলেই হাসিয়া খুন, তবু তিনি হরিপদর কথার মান রাখিয়া বলিয়াছিলেন, কী রে আর ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ ছাড়ছে ?

এবং পরে বলিয়াছিলেন, ব্যাটা মন্দ বলেনি। সর্বক্ষণ একটা সুগন্ধের বাতাসে মন ভাল থাকে।

ওঁকে দেখিলেই আমার ঠাকুরদার ছাত্রদের প্রতি শিক্ষার কথা মনে পড়িয়া যাইত। ঠাকুরদা বলিতেন—শুধু বিদ্যেয় বড় হলেই বড় হওয়া যায় নারে! গুণে বড় হতে হয়। সেই গুণটি হচ্ছে নত হবার শক্তি!···নিজেকে মস্তবড় ভেবেছ কি গোল্লায় গেছ!

তা নত হতে পারাটা যে সত্যিই একটা মহাশক্তি, তা এখন পাঁচজনকে দেখে দেখে বুঝছি!

বড়দি ঠিকই বলিয়াছিলেন, এ সংসারে ঘুণ ধরেছে।

সত্যই তাই। ঘুণে ধরা জায়গায় হাত দিলেই যেমন ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তেমনি পড়িতেছে।

কিছুদিন আগেও কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না মনোহরপুকুরের এই মুখুয্যে বাড়িতে সাতটা হেঁশেলে সাতটা হাঁড়ি চড়িতেছে। সাতটা ভাগে আলাদা আলাদা মাছ তরকারি বাজার আসিতেছে!···ছোট ছেলেপুলেরা জলখাবার খাইতেছে—নিজ নিজ মায়ের কাছে নিজেদের ঘরের মধ্যে লুকাইয়া।

লুকাইয়া কেন ?

কেন আর খাদ্যবস্তুর তারতম্য থাকার ফলে।

এক একজন গৃহিণী এক এক মতাবলম্বী। কেউ ভাবেন, যত অল্প খরচে পারা যায় সংসার চালাই। কেউ কেউ ভাবেন, যথেচ্ছ বড়লোকি দেখানোর গৌরব আছে। · কেউ কেউ বিলাতি ধরন পছন্দ করেন তাই তাহার ঘরে বাচ্চাদের জন্য মজুত রাখেন হাণ্টলি পামারের বিস্কুটের টিন, লজেন্স কেক! পাঁউরুটি, হর্লিকস!

আর যিনি দেশীয় ভক্ত, তিনি ঘরে মজুত রাখেন মেঠাই সন্দেহ নাড়ু। ঘন সরপড়া বাড়ির গরুর দুধ!

কোনও কোনও ঘরে আবার রাত্রে ভাতের পাট উঠাইয়া দিয়া—লুচি পরোটা ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাবেকি রান্নাঘরে দুইটা বড়বড় গনগনে উনুন জ্বালিয়া বামুন ঠাকুরের সেই হিমসিম খাওয়ার দৃশ্য আর নাই। নাই খাবার দালানের সেই রমরমা। সকলের একত্র হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প।

এখন সব কিছুই যেন চুপিসাড়ে হইতে থাকে।

কর্তারাও আর রাতে খাওয়ার পর আবার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতে যান না। যে যার আপন আপন ঘরে ঢুকিয়া পড়েন। তাড়াতাড়ি বাড়ির আলো নিভিয়া যায়।

এককথায় সংসারের সব কিছুই জৌলুস হারাইয়া বসিয়াছে।

কেবলমাত্র একটি মানুষের তিরোধানে এমন হইয়া গেল! ভাবা যায় না!

কী আর বলিব। প্রতিপদে প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, এ কী হইল! সহসা এমন হইল কী রূপে?

আসলে—একবার লজ্জার খোলসখানা খুলিয়া ফেলিয়া আসরে নাচিতে নামিলে যেমন ক্রমশই নির্লজ্জতার প্রকাশ ঘটে, এ যেন তাই।

সর্বদাই যেন নির্লজ্জতার প্রতিযোগিতা!

সব থেকে দুঃখ হয়, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ঘুচিয়া যাওয়ায়। সেই যে সকলে হৈ হৈ হাসি খুশি সঙ্গে নিচের তলা হইতে ছাত পর্যন্ত দাপাদাপি করিয়া খেলিত, মেজ খুড়ি অসহিষ্ণু গলায় বলিতেন, ভাঙবে। বাপ ঠাকুর্দার আমলের ভিটে খানাকে ভেঙে ছাড়বে দস্যিরা! বলি এত দস্যি-বিত্তি খেলা কেন? ঠাণ্ডা হয়ে খেলা যায় না?

তাহাদের সেই অবাধ উদ্দামতার প্রকাশ আর নাই।

এখন চুপি চুপি মায়েদের কাছে আলোচনা করে। আজ কোন ঘরে কাদের কী রান্না হইয়াছে। স্কুলে কে কী টিফিন লইয়া গিয়াছিল! এবং তাই লইয়া ভ্যাংচায়, হাসাহাসি করে।

দেখিয়া হঠাৎ হঠাৎ এমন কষ্ট হয়। আর তখন ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, ভাগ্যিস আমার কোনও ছেলেপুলে হয় নাই।···হইলেই তো তাহারাও এমনি নীচতা শিখিত। এমন অধঃপতনের পথে যাইত!

অথচ উহাদের দোষ কী?

মনে হয় মেজখুড়িকে বলি, ওরা দস্যিবৃত্তি খেলে বাপঠাকুর্দার ভিটেখানার একখানা ইটও খসাতে পারেনি মেজকাকিমা। প্রত্যেকখানি ইটকাঠ খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে চুরমার করলেন তাঁরা, যাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় এক সর্বনাশা খেলা খেলতে বসলেন।



॥ ২৭ ॥

গেল ! গেল ! সব গেল !

গেল সেই নন্দীগ্রামের আভিজাত্যের গৌরব, বনেদিয়ানার আত্মতৃপ্তি। সাবেকি চালের অহমিকা। গেল—বংশমর্যাদার ঐতিহ্য।

আস্তে আস্তে ঠাট বাট সব গেল। গেল সভ্যতা ভব্যতা চক্ষুলজ্জা।

কুয়োর দড়িটাকে একবার হাত হইতে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন সড়সড় করিয়া নামিয়া যাইতে থাকে, তেমনি সমস্ত পরিবারটা সড়সড় করিয়া কুয়োর তলায় নামিয়া গিয়া কাদায় ঠেকিতেছে!

এক টুকরো মাংসখণ্ড লইয়া একপাল কাক যেমন কাড়াকাড়ি করে, এখন তেমনি এই সংসারখানা। আর এই বাড়ি গাড়ি বিষয় সম্পত্তি লইয়া কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ি। ··

বড় হতে হলে নত হতে হয়!

কিন্তু নীচ হতে হয় কি ?

এখনকার নম্রতার শিষ্টাচারের পালিশটুকুও নাই। আছে নীচতার আর অনিষ্টাচারের কর্কশতা।

নিত্যদিনের এইসব কটু কুৎসিত ঘটনার কথা আর লিপিবদ্ধ করিয়া

রাখিতে ইচ্ছা করে না।

তবু—বাড়ির সার্বেক জুড়িখানা এবং শ্বশুর মহাশয়ের টমটম খানার অধিকার লইয়া যা নির্লজ্জতা দেখিলাম তা দেখিয়া পাতালে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল।

জুড়িগাড়িখানা কে কতটুকু, অথবা কতখানি ব্যবহার করে তার হিসাব চলিতে থাকে, সেই অনুপাতে হিসাব হইতে থাকে কোচম্যান আর সহিসের মাহিনা এবং ঘোড়াদের দানাপানির ভাগের। কে কতটা দিতে বাধ্য?

শ্বশুর মহাশয়ের নিজস্ব টমটমখানির স্বত্ব লইয়া ক্রুদ্ধ তর্ক কেবলমাত্র তাঁর ছেলেদের মধ্যেই।…

ছোট ভাই নবু কোর্টে যায় বলিয়া এতদিন একা তাহার সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে বাবার সঙ্গী হইয়া। এখন কোন মুখে সেই নিয়ম চালাইয়া যাইতেছে?

পরদিন হইতেই উনি গাড়ি ত্যাগ করিয়া ট্রামে যাতায়াত শুরু করিলেন।

আর যিনি কিছুদিন আগে নিজস্ব ব্যবহারের শখে একখানি ফিটন কিনিয়াছিলেন? তিনি নাকি সেটিকে তাড়াতাড়ি বেচিয়া ফেলিয়াছেন। যৌথ সংসারে কেহ কোনও সম্পত্তি ক্রয় করিলে না কি, সকলেই ভাগিদার হইয়া যায়! তাই!

ওঃ। জগতে এতও আছে।

এর নাম আইন। আর আমার পরম ভালবাসার জন কিনা সেই আইন ব্যবসায় লাগিয়াছেন।

উনিও কি ঠিক অন্য সকলের মতো।

তা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণত্যাগ করিতাম। উনি এই নির্লজ্জতা আর লড়ালড়ি খেয়োখেয়ি দেখিয়া ক্রমশঃই যেন নির্বেদগ্রস্ত হইয়া যাইতেছেন।

উনি নিজের ভাগ আর তার হিসেব নিকেশ লইয়া কোনও কথা বলেন না। বলেন, তোমরা যা বোঝো করো। আমার কিছু দরকার নেই। যা রোজগার হয় তাতে আমার চলে যাবে।

তাতেও কি ছাড়ান আছে।

নিঃসন্তানের পক্ষে যে অমন উদারতা দেখানো সম্ভব সেই কথাটিই সবাই ঠারে ঠোরে বলে।

শুধু একটি জিনিস সম্পর্কে উনি বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "ওটি আমার কাছে থাকলে কি তোমাদের আপত্তি হবে?

জিনিসটা কী?

যাহাতে তিনি স্বভাব ছাড়া এমন একটা কথা বলিয়াছিলেন।

জিনিসটি আমার শ্বশুরের একখানি চওড়া সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত ফটোগ্রাফ।

শ্রাদ্ধসভায় রাখিবার জন্য, দুইচার দিনের মধ্যে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড নামের নাকি একটি সাহেবের দোকান হইতে করাইয়া আনা হইয়াছিল।

আর ওই ফ্রেমটি ? স্বামী নিজের পছন্দে করাইয়া ছিলেন।

বাবার ছবিটা ? একা তোর কাছেই রাখতে চাস ? বাবার ছবিটি দেখতে অবশ্য সকলেরই ইচ্ছে হতে পারে মাঝে মাঝে। তো ঠিক আছে। রাখ তুই ! ছোট ছোট আরও ছবি আছে বাবার। গ্রুপ ফটোর মধ্যে ! আচ্ছা তাই হবে। তুই নিস।

বিরাট একটি উদারতা দেখাইয়া মেজ ভাসুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বাবার পার্সোনাল ব্যবহারের আরও কিছু জিনিস যদি রাখতে চাস রাখিস ! বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

ইনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন বাবা সকলকেই সমান ভালবাসতেন সেজদা।





॥ ২৮ ॥

তারপর ?

হ্যাঁ তারপর একেবারে সিঁড়ির নিচের তলায় নামিবার জন্য সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলা চলিতে থাকে।

ভাগ হইতে থাকে খাট, পালঙ্ক, আর্শি, আলমারি, শাল দোশালা জরি জড়োয়া।

সোনা-দানা তো আগেই হইয়াছিল। ক্রমশঃ বাসনপত্র, ঘর সাজানোর টুকিটাকি অথচ মূল্যবান। একটি বৃহৎ তিনতলা তিন মহলা বাড়ি যাকে অট্টালিকাই বলা উচিত। তাকে আদ্যোপান্ত সাজাইয়া রাখিতে যে কত জিনিস লাগে সে কথা রাংচিতা গ্রামের পণ্ডিত মশাইয়ের নাতনির কি জানা ছিল? হাসির জানা ছিল কি? জানিল মুখুয্যে বাড়ির বৌ দিব্যহাসিনী।

এইসব সাজানো সবই প্রায় বিলিতি ফ্যাশানে। বিলিতি ফ্যাশানই নাকি আসল ফ্যাশান। তবে হ্যাঁ—আহারে বিহারে আচারে আচরণে নিজেদের

সাজসজ্জায় তেমন উগ্র সাহেবি নহেন ইহারা। বাড়ি সাজানোর ব্যাপারে ওই বিলাতি ঘেঁষা শখ।

সিঁড়ি যে সাজাইতে হয় তো কে জানিত?

সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে এক একখানা বাহারি টুল রাখিয়া তাহার উপর রুপোর কি পিতলের ফুলদানি। কি—পোর্সিলিনের পুতুল। মূর্তি বসাইয়া বসাইয়া রাখিতে হয়, এবং সেইগুলিই ঝাড় মোছ করিতে খাওয়া পরা মাহিনা দিয়া আলাদা একটা লোক রাখিতে হয়। এমন কথা বুঝিতেই অনেক দিন লাগিয়াছিল আমার! আর আজ?

যখন সব শিখিয়া সব কিছুর উপর মায়া পড়িয়া গিয়াছে, তখন দেখিতে হইতেছে। সেই সবের উপর ধুলা জমিতেছে। এবং হঠাৎ হঠাৎ টানিয়া নামাইয়া ভাগের হিসাব কষা হইতেছে কে কোনটা লইবে।

সিঁড়ির দেওয়ালগুলোও তো সাজানো ছিল। বৃহৎ বৃহৎ অয়েল পেণ্টিং, চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো আয়না!

আর যে একটা ভয়ংকর জিনিস আছে, সেটাকে যে কোন পছন্দে সামনের দেওয়ালে সাঁটিয়া রাখা হইয়াছে ভগবানই জানেন।

ভীষণ দর্শন একখানা মোষের মাথা। তার বাঁকানো গোলাকার দুই শিং, চোখ দুইটা যেন গিলিয়া খাইতে আসিতেছে। এই কি সৌন্দর্য?

প্রথম প্রথম আমি একা ওই সিঁড়িটা ওঠানামা করিতে পারিতাম না। ক্রমে গা সহা হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এইসব বৃহৎ বৃহৎ জিনিস কাহার কোন কাজে লাগিবে!

এতবড় চওড়া সিঁড়িওয়ালা বাড়ি আর জুটিবে?

তবু দেখি এইসব ভাগাভাগির সময় মহিলারাই ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন।

ঠাকুরঘরের সাজ-সরঞ্জাম লইয়াও কি কম কথা কাটাকাটি। কম চেঁচামেচি? সেখানে শুধু ঠাকুরের বাসনপত্রই নয়, সবই তো রুপোর।

ঠাকুরের টাট সিংহাসন ঘণ্টা কাঁসর পঞ্চ প্রদীপ চামরের হাতল, গোপালের ছাতা ইত্যাদি সবই তো রুপোর। অতএব ভাগের হিসাব চুলচেরা হওয়া উচিত।

বড় জ্যাঠাইমা বিছানায় শুইয়াই ওই লইয়া গলা ফাটানো চিৎকার করিলেন। অনেক গালি গালাজও করিলেন। অবশেষে কেমন করিয়া মতবিরোধ কাটিল, সকলে সহমত হইলেন, তাহা জানা নাই।

কিন্তু আসল ব্যাপারেই যে সহমত হইতেছে না। সেখানে পাহাড় প্রমাণ বাধা!



॥ ২৯ ॥

হিসাব হইয়াছিল বাড়িটাকে এতগুলো ভাগে সমান ভাগ করা যখন সম্ভব নয়, তখন বিক্রি করিয়া দিয়া টাকাটা ভাগ করিয়া লওয়া হোক। সে ক্ষেত্রে ভাগ করিতে বেশি কাঠখড় পোড়াইতে হইবে না। বেশি মাথা ঘামাইতে হইবে না।

কিন্তু সেখানে মস্ত ফ্যাকড়া। ভাগিদারদের সকলেই সহমত হইলেন না।

কেউ কেউ বলিলেন, আমার পক্ষে কেবলমাত্র কিছু টাকা নিয়ে আলাদা বাড়ি করে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পুষ্যি অনেক। একগাদা ছেলে মেয়ে মানুষ করতে বাকি। আমার অনেক অসুবিধে।

তাঁরা সই দিলেন না। কাজেই মামলা ঝুলিতে লাগিল। বাড়ি বিক্রি হইল না। এখনও সেই মামলা ঝুলিতেছে।

যাঁহাদের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

কোথায় গেলেন জানাইয়াও গেলেন না কেউ কেউ।

যাঁহাদের সঙ্গে ছিল প্রতি দিন রাত্রি প্রতিক্ষণ একসঙ্গে ওঠা বসা, খাওয়া শোয়া, প্রতিটি নিশ্বাস প্রশ্বাসের শরিক হওয়া, তাঁহাদের সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কিনা, জানা গেল না।

কিন্তু যাঁহারা রহিয়া গেলেন ?

তাঁহাদের সঙ্গেই কি একই অবস্থা রহিল। পরস্পরে কথা বন্ধ হইয়া গেল না ? একই ছাতের নিচে থাকিয়াও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইল না ?

তবে আর থাকা এবং চলিয়া যাওয়ায় তফাত কোথা ?

বরং এ থাকাটা আরও ক্লেদাক্ত কুৎসিত। যেন নির্লজ্জতার উলঙ্গ রূপ।

কিন্তু আমি ? আমার স্বামী ?

আমি কী করিব ?

সহজভাবে কথা বলিতে গেলে যদি কেউ মুখ ঘুরাইয়া লয়, করিবার কী আছে ?

আর আমার স্বামী ? তাঁহার যে এক বিশেষ জ্বালা।

যেহেতু, বাড়ির মধ্যে তিনিই হইতেছেন উকিল। কাজেই, ঘরে বাইরে সকলেই তাঁহার কাছে আইন বিষয়ক পরামর্শ লইতে আসে।

যেমন হয়, বাড়িতে কোনও ছেলে ডাক্তার হইলে। তাহার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে ওঁর মানসিক অবস্থা কেউ বুঝিতে পারিতেছে না।

এই ভাগ ভিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা তাঁহাকে যেন দিকভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এ জিনিস তাঁহার মনের পক্ষে যেন অসহনীয় !

কোনওদিন যে হাসিতে জানিতেন, সে কথা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

স্নান আহারের ঠিক নাই। সর্বদা ক্লান্ত ক্লিষ্ট, বিষণ্ন গম্ভীর।

আমি তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিলে, অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন।

রাত্রে এমন অবস্থা, বিছানায় পড়ার আগেই ঘুমাইয়া পড়া। অথবা সারারাত ঘুমহীন অবস্থা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খাওয়া আর পায়চারি করা।

আমরা যারা থাকিয়া গিয়াছি, সকলে যে যার ঘরেই আছি অবশ্য। যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরে ঘরে তালা ঝুলিতেছে।

রাত্রির অন্ধকারে বাড়িখানাকে যেন একটা দৈত্যের মতো দেখিতে লাগে। উনি নিদ্রাহীন রাত্রে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান। চকমেলানো বাড়ির বৃহৎ উঠানটার দিকে চোখ ফেলেন, এক সময় চলিয়া আসেন। ওঁরও হয়তো আমারই মতো মনে পড়ে। কাজে কর্মে ওইখানে কত জমজমাট আড্ডা বসিয়াছে। সারি সারি চেয়ার পাতিয়া নিমন্ত্রিতদের বসানো হইয়াছে। অবিরত পান তামাক জল শরবত পরিবেশন করা হইয়াছে, কোনও কোনও মজলিশি জনের হাসির আওয়াজ আকাশে উঠিয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আমারও কেমন গা

শিরশির করিয়া ওঠে। তবু তাঁহাকে জোর করিয়া ডাকিয়া ঘরে আনি।

আর আকাশ পাতাল ভাবি অতঃপর এই বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই শোবার ঘরটি? যা আমার কাছে স্বর্গতুল্য। সেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে? প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে।

কেন? কেন এমন করিলে ঠাকুর? কার অভিশাপে এমন হইল? আবার ভাবি সব যাক। ওঁর সঙ্গে যদি গাছতলাতেও থাকিতে হয়, সেই আমার স্বর্গ! কিন্তু হঠাৎ একদিন দিন দুপুরে প্রাণের মধ্যে একটা হাহাকার উঠিল। উঠিল একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায়!

আমার সেই সুন্দর খাতাখানা কোথায় গেল? কই আর তো সেটিকে কোনও দিন দেখিতে পাই নাই?···মনেও পড়ে নাই। হঠাৎই মনে পড়িল।··· শেষ দেখা তো সেই অভিশপ্ত রাত্রে!





॥ ৩০ ॥

সেই রাত্রির প্রতিটি কথা মনে পড়িয়া গিয়া বুক যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে যায়। ···মনে পড়িতেছে, যখন স্বামী আমাকে সেই গানের মানেটি জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মনে হইয়াছিল—আরও সুন্দর একটি গান টুকিয়া রাখিয়াছি, সেটিও শুনাইব। কিন্তু কে ভাবিয়াছিল, সেই মুহূর্তে আকাশ হইতে বাজ নামিয়া আসিবে?

কিন্তু খাতাটা?

খাতাটা কে কোথায় রাখিল?

আমি তো বিছানায় ফেলিয়া রাখিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম।

তারপর?

কতদিন পরে আবার এই ঘরে শুইতে আসিয়াছিলাম?

নিয়মভঙ্গের পরের দিন বোধহয়।

তার আগের দিন পর্যন্ত তো উনি নিচের তলার দালানে খড়ের বিছানায় কম্বল পাতা শয্যায় শুইয়াছেন অন্য সব ভাইদের সঙ্গে। আর আমরা বৌরা

—দোতলার ভিতর দালানে। সেও কম্বল শয্যাতেই। তবে খড়ের বিছানায় নয়।

চুলে তেল চিরুনির স্পর্শ নাই, গায়ে জামা সেমিজ দেওয়া নিষেধ, এক বস্ত্র সার। সকলেরই একই মূর্তি।

আশ্চর্য! তখনও পর্যন্ত তো মনে হইয়াছে, জায়ে জায়ে আমরা সবাই একাত্ম!

আর এখন?

এখন কেউ ভাবিতে পারিবে, বড়দি মেজদি সেজদি নদি সবাইয়ের সঙ্গে একই দালানে পাশাপাশি শুইয়া আছি!

খুড়শাশুড়িরাও তো প্রায় একইভাবে অশৌচ বিধি মানিয়াছিলেন। কেবলমাত্র মালশায় হবিষ্যান্নটি ছাড়া।...

শ্বশুর ভাসুর নাকি সমতুল্য।

কিন্তু সে কথা থাক! এখন আমার সেই খাতাখানির কথা মনে পড়ায় প্রাণ হু হু করিয়া উঠিতেছে।

কোথায় গেল? কোথায় গেল?

আমার পরম প্রিয়তমের পরম আদরের সেই উপহারটি?

সেই জিনিসটিকে তো কোনওদিন কাহাকেও দেখিতে দিই নাই। দেরাজ সিন্দুকের লুকানো ড্রয়ারে তুলিয়া রাখিতাম। শুধু সেই সর্বনেশে দিনটিতেই—

ও মনের কথা। মনে পড়াইয়া দাও না। এই জাবদা খাতাখানির মতো তাহাকেও খোলা ড্রয়ারে রাখিয়া দিলেই কি থাকিত?

বেশি যত্নের কারণেই কি?

নাঃ! আর ভাবিতে পারিতেছি না।

সেই রাতের কথাই কেবলই ভাবিয়া চলিতেছি।

এত দিকে এত ভাঙন দেখিয়া চলিয়াছি। কত কী হারাইলাম, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

সে তো কেবলমাত্র বাহিরের বস্তুই নয়। ভিতরেরও কত অদৃশ্য সম্পদ হারাইয়া গেল। সবই সহিয়া গিয়াছে। তবু ওই খাতাখানার কথা মনে পড়ার পর হইতে প্রাণের মধ্যে এত এমন হায় হায় কেন? মনে হইতেছে, এটি আমার দোষেই গেল।...

আহা উনিই কি কোনও সময় দেখিতে পাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন?

জিজ্ঞাসা করিব?...নচ্ছার বাধা? তা হোক—করি না একদিন কপাল ঠুকিয়া।

বলি বলি করি, বলিতে পারি না। দিনের পর দিন যায় বলা হয় না।

যখনই বাড়ি ফেরেন, যেন বিধ্বস্ত অবস্থা!

সেই অবস্থায় সামান্য একটা খাতার কথা মুখে আনা যায়?

অথচ যেই তিনি সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান, সেই মনে হয়, আজ চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া নিশ্চয় একটু জিজ্ঞাসা করিব।·· সারাদিন মনে মনে রিহার্সাল দিয়া চলি কীভাবে কথাটা পাড়িব? মুস্কিল এই—

খাতাটার সঙ্গেই যে একটা দুঃসহ দুঃখের স্মৃতি জড়ানো। বলামাত্রই ওঁর মনের মধ্যে সেই রাতটির ছবি জাগাইয়া তোলা হইবে না?

এদিকে মনের মধ্যে সর্বদা ঢেঁকির পাড়-পড়িয়া চলে। কাহার হাতে পড়িয়াছিল? কী ভাবিয়াছে সে?

যদি গুরুজনেরা কেউ হন?

কাহার হাতে পড়া সম্ভব?

বড়দি?

নাঃ বড়দির হাতে পড়িলে তিনি তখনই বলিতেন।

ভাসুররা কেউ?

খুড়শ্বশুররা!

জায়েরা?

বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা! দাসদাসীরা!

যাহাদের আমাদের ঘরে যাতায়াত আছে। যাহাদের কদাচও নাই, তাহাদের সকলের মুখ চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। কে? কে? কে? না সব অলীক মনে হয়।

হায়। আমার একখানা সোনার গহনা হারাইল না কেন? তাহা হইলে, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম। হয়তো ঘরমুছুনি, কি ঘরের ঝুল ঝাড়ুনি কাহারও হাতে পড়িয়াছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হইবার কিছু নাই।

কে আমার সেই প্রাণতুল্য জিনিসটির যথার্থ মূল্য বুঝিবে?

হয়তো গহনার কেস-এর মতো দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া সরিয়া পড়িয়া পরে—নেহাত একখানা খাতা মাত্র দেখিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

ঠাকুমা বলিতেন, যে চুরি করে তার এক পাপ, আর যার চুরি যায়, তার শতেক পাপ!

কারণ অবিরত যাকে নয় তাকে সন্দেহ করিতে থাকে।

বড়রা কত অভিজ্ঞ। এতদিন পরে ঠাকুমার সেই কথাটি মনে পড়িতে থাকে।

নাঃ। আর পাপ বাড়াইব না।

এখন মনে হইতেছে উনিই হয়তো কোনও সময় চোখে পড়ায় তুলিয়া রাখিয়াছেন।

উনিই তো তার যথার্থ দাম বোঝেন, কেন, মিথ্যা একটু লজ্জার ভয়ে, এই পাপ আর যন্ত্রণা বহিয়া বেড়াইব ?

সারাদিন ধরিয়া মনে মনে রিহার্সাল দিতে থাকি আচ্ছা হ্যাঁ গো, ইয়ে রোজ বলব বলব ভাবি আর ভুলে যাই। তোমার দেওয়া সেই সুন্দর খাতাখানা কোথাও দেখেছো ? কোথায় যে রেখেছি। খুঁজে পাচ্ছি না। এত মন খারাপ লাগছে !

স্থির নিশ্চিত হই—বলা মাত্রই উনি বলিয়া উঠিবেন। আরে তুমি কেন, আমিই তো—পড়েছিল দেখে তুলে রেখেছি।

আঃ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা জুড়াইয়া যাইবে !

কিন্তু কথাটা কী বলা হইয়াছিল সেদিন ?

তিনি কি ঠিক অন্যদিনের মতো অবস্থাতেই ফিরিলেন ?





॥ ৩১ ॥

বাপি!

রাত্রে শুয়ে পড়ার পর, হঠাৎ নিজের ঘর থেকে উঠে এসে ডেকে ওঠে, বাপি। সেই দেরাজ সিন্দুকটা এখন কোথায় আছে?

সবে ঘুম আসা কিশলয় চ্যাটার্জি হঠাৎ যেন হিব্রু ভাষা শোনে।

কী? কী বলছিস রে?

আঃ। কবার বলব? বলছি সেই মনোহর মুখুয্যের বাড়ি না কোথা থেকে যে দেরাজ সিন্দুকটা পেয়েছিলে। তুমি একদিন একটা মিস্ত্রিকে দেখাচ্ছিলে।

ওঃ! বুঝেছি। মনোহর মুখুয্যে নয়। মনোহরপুকুর রোডের মুখুয্যে বাড়ির। তো সেটা তো সেই বিনোদ মিস্ত্রিকে বিক্রি করে দেওয়া হল! দুদিন পরেই টাকা দিয়ে গেল!

বাপি!

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ফুলকি, একেবারে টাকা নিয়ে টিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে?⋯ওঃ বাপি! তোমরা কী? অ্যাঁ? তোমার কি কিছু টাকা ছিল না বাপি? তাই ওই অদ্ভুত সুন্দর জিনিসটা বিক্রি করে দিতে ইচ্ছে হল? কোন প্রাণে বাপি?

প্রথমটা জিনিসটা দেখে ফুলকি অবশ্য শুধু অদ্ভুত বলেছিল। বলেছিল, কী অদ্ভুত জিনিস রে বাবা! এই পেল্লায় একখানা পাহাড়ে ফার্নিচার, ঘরের মধ্যে রাখা হত? সেকালে কী টেস্টই ছিল!

এখন বলছে, অদ্ভুত সুন্দর।

বলছে কোন প্রাণে বিক্রি করে দিলে বাপি?

চির অপরাধী বেচারা বাপি। বলে, তা তোর সামনেই তো বেচে দেওয়ার কথা হল বাপু! কিছু বলিসনি তো! আমার তো বরং একটু ইচ্ছে ছিল নিজেই রাখলে হয়। তো তোর মা বলল, এই বাড়িতে ওই ঢাউস জিনিসটা ধরবে কোথায়!

তখন জানতাম না সেই হ্যামিলটনের দোকানে কেনা, গয়নার কেস-এর মতো লাল মখমলের মলাট খাতাখানা ওর ভেতরের লুকোনো চেম্বারে থাকত!

এই দ্যাখো। আবার পাগলামি শুরু করল।

সুচেতা কড়া গলায় বলে, তুমি ওকে একটা ডাক্তার দেখাবে কি না?

ছাড়ো তো তোমার একঘেয়ে কথা মা! বাপি তুমি কাল সক্কালবেলাই তোমার সেই বিনোদের কাছে যাও। বল গে, ওর ভেতরটা আর একটু ভাল করে দেখতে চাই!

কী মুস্কিল। সেকি এখনও সেটা অ্যাজ্ ইটিজ্ রেখেছে? হয়তো কেটে কুটে হালকা কিছু কিছু শৌখিন ফার্নিচার বানাতে শুরু করেছে। দামি কাঠ! সস্তায় পেল, লুফে নিয়েছে।

তা তো নেবেই। যারা তার দাম বোঝে, লুফে নেয়। আনাড়িরা অগ্রাহ্য করে। এখন কী হবে? সেই খাতাখানা যে আমার একটু দেখা খু-ব দরকার!···ও বাপি! তোমার পায়ে পড়ি—একবার যাওনা তার কাছে। ···হয়তো এখনও ভাঙেনি। অন্য কিছু কাজে ব্যস্ত ছিল। তুমি গিয়ে বললেই হয়তো বলবে, ভেতরে আলাদা চেম্বার? কই দেখিনি তো।···আহা দেখছি—ও বাপি! তুমি তার বদলে অনেক টাকা দেবে বোলো। তা হলে ঠিক খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে।

কিশলয় হেসে ফেলে বলে এখন, এই রাত্তিরেই যাব?

আহা তাই যেন বলেছি? তুমি 'আচ্ছা যাব' বললে শান্ত হয়ে ঘুমোতে যাই।

শান্ত হয়ে তুমি আর ঘুমিয়েছ!

সুচেতা ছিটকে উঠে, ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল এনে গলায় ঢালতে ঢালতে বলে, নিজেও শান্ত হয়ে ঘুমোবে না, অন্যকেও শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না!···এই একটা কাম্পোজ খেয়ে ফেল দিকি। ঘুম ছাড়া ভূত ছাড়াবার ওষুধ আর কী আছে? মাথার মধ্যে যারা দাপাদাপি করছে, তাদের ঠাণ্ডা

করা দরকার ফুলকি !···আচ্ছা ফুলকি, ভেবে দ্যাখতো, আগে তুই এরকম ছিলি ?

আগে কে কী থাকে, তার হিসেব থাকে মা ? তুমিই কি আগে এরকম ছিলে ? রাতদিন কাঠি হাতে বেড়াতে ? সেলাই কলে কত সেলাই টেলাই করতে।

ওঃ সেলাই কলে ! আমার ছাঁটকাটে তৈরি জামা আর পরবে তোমরা এখন ? আগে—পরেছ বাবা মেয়ে দুজনেই।

পরবে ! যা ছিরির কাটছাঁট ! আগে জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না তাই পরা হয়েছে। এখন আর সম্ভব হয় না মা। তার সঙ্গে তুমি আমার ব্যাপার তুলনা কোরো না মা !···একশো বছর আগে মেয়ে যে জিনিসটা হারিয়ে ফেলে পাগলা হয়ে গেছিল, সেটা দেখতে ইচ্ছে করে না ?

ইচ্ছে করলেই পারি ? হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া জলে ছেড়ে দেওয়া জিনিস আবার হাতে ফিরে আসে ? বেচে দেওয়া জিনিসের পিছনে ছুটতে যাবে মানুষ ?

মাগো ! দয়াময়ী মা গো ! একটু চুপ করবে ? তোমায় তো ছুটতে বলিনি মা। বলেছি—আমার নিজের বাবাকে ! তাও লোকটা বুঝদার আছে বলেই। তোমার মতো অবুঝ বে আক্কেলে হলে কি আর বলতাম ?

ফুলকি ! তুমি কী চাও, আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাই ?

সর্ব-না-শ ! কী কথা বলছ মা ? চিরচেনা বাড়ি থেকে চলে যাবে তুমি, এই আমি চাই ? আমি দিব্যহাসিনীর সেই মাগুলোর মতো নিষ্ঠুর আর কুটিল ? ···না গো মা। রাগ কোরো না মা ! আমি শুধু একবার সেই খাতাখানা দেখতে চাই। তারপর আর কিছু জ্বালাতন করব না বাপিকে।···মুস্কিল হচ্ছে এই—ওই তোমার হাড় জ্বলানো পয়া খাতাখানার শেষের দিকের কখানা লুজ পাতা কী রকম এলোমেলো হয়ে গেছে—পাচ্ছি না। পৃষ্ঠার নম্বরও তো নেই ! ওই যা সেলাইয়ের বাঁধন ছিল ! বাপি যদি পেয়ে যায় সেই খাতা খানা, তাহলে ঠিক আছে। না পেলে, আবার গোড়া থেকে দেখতে হবে—মানে জিনিসটা সে পেয়েছিল কিনা। আর তারপর কী হয়েছিল !

কিশলয় আস্তে বলে, আচ্ছা বাবা আচ্ছা ! কথা দিচ্ছি, বিনোদের কাছে যাব কাল। এখন ঘুমোবি তো ?

বলে পাশ বালিশটাকে সে ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফেরে।

বাপি গো। তুমি কী সুখি সত্যি ! আর জন্মে তুমি বোধহয় কোনও বনেদি বাড়ির মেজকর্তা ছোটকর্তা ছিলে। বেশ আরাম আয়েশটি আছে, কিন্তু দায়িত্বটি নেই।···বিছানায় শুলেই ঘুমটি এসে যায় !

তা আসবে না কেন ? তোর মতো শয্যা কণ্টকী হতে থাকবে সেই

খাতাখানা কোথায় গেল বলে। সেই দলিল পত্তরগুলো কোথায় গেল বলে।

সুচেতা মশারিটা ওড়াতে ওড়াতে বলে, গাদাগুচ্ছের মশা ঢুকিয়ে দিয়ে গেলি তো?

আমি ঢোকালাম? বাঃ!

কিশলয় ঘুম জড়ানো গলায় বলে, রাতদুপুরে হচ্ছেটা কী? মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া!

এ মা! বাপি। তুমিও এইসব সেকেলে ছড়া জানো!

জানব না কেন? ছেলেবেলায় সেকেলে বুড়িদের কাছেপিঠে থাকিনি? আসলে—পরম্পরা ক্রমে এসব—চলেই আসে!···তবে তোর মায়ের মতো যারা জোর করে প্রতিজ্ঞা করে সেকেলে কথা শুনব না, সেকেলে কথা বলব না—তাদের কথা আলাদা! হা হা।

বাপি। মাকে রাগিয়ে দিতে তুমিও কম যাও না। যত দোষ নন্দ ঘোষ এই ফুলকির।

বলে ফুলকিও হাই তুলতে তুলতে চলে যায়।

বাবা আশ্বাস দিয়েছে কালই বিনোদের কাছে যাবে, তাই মনটা ভাল লাগছে।··ইস। যদি পাওয়া যায়।

খাতাখানা ফুলকি চোখে দেখেনি, তবু যেন তার চোখের সামনে ভাসছে, তা বর্ণনা শুনেও এমন হয় বৈকি।

আজকাল তো পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে এমন সব শিল্পী আছে যারা—কেবলমাত্র চেহারার বর্ণনা শুনে, অপরাধীর ছবি এঁকে দিতে পারে।



॥ ৩২ ॥

কিন্তু বাবা আশ্বাস দিয়েছে বলেই কি ফুলকি নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করে বসে থাকবে ?…সেই পৃষ্ঠা নম্বরহীন এলোমেলো পাতাগুলোকে নিয়ে পড়তে বসে পরদিন সকাল হতেই।

দেখবে—পরবর্তী অংশে লেখা আছে কিনা, খাতাটার হদিস পাওয়া গিয়েছিল কিনা।

আর যে মানুষটা জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরল, তার জ্বরটা ছাড়ল কবে ?…তা খাতা উল্টে দেখবার আগেই ফুলকি মনে মনে নিজেই ঠিক করে নিয়েছে—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া আক্রমণ করেছিল তাকে। সেকালে তো ভীষণ ম্যালেরিয়া হত। ছেড়েছে পরে ঠেসে কুইনাইন গিলে গিলে। আহা! কীই বা চিকিৎসা ছিল। সেই তখনকার দিনে ?

কিন্তু অনেক চেষ্টায় সিকোয়েন্স-এ খাপ খাইয়ে খাইয়ে সেই সেলাই খসে যাওয়া পাতাগুলোর পাঠোদ্ধার করে ফেলার সময় ফুলকির চোখদুটো অমন বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছিল কেন ?

হঠাৎ একবার গলায় হাত বুলোচ্ছিল কেন ?…

পড়ার শেষে সব ছড়িয়ে রেখে অমন নির্জীব মতো হয়ে শুয়ে পড়ল কেন ?

কী লেখা ছিল সেই পাতাকটায় ?



॥ ৩৩ ॥

উঃ ভাগ্যিস সে সময় সেজ ভাসুর বাড়িতে ছিলেন! সেজ আর ছোট এই দুই ভাসুরই তো এখনও এই ভিটেতেই বাস করছেন। বড় মেজ ন নতুন—এঁরা তো বাড়ির ব্যবস্থা করে চলেই গেছেন।

বড় ভাসুর তো আগেই কবে নাকি কালীঘাটের দিকে কোথায় একখানা ছোট দোতলা বাড়ি কিনিয়াছিলেন, সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে বলে। মেজ সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়া উঠিয়াছেন। সেখানেই আছে, বাকি দুজন বোধহয় ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতেছেন। খবর তো দেন না কেউই কোনও।

সেজ আর ছোটরও মধ্যে ছোটই তো সই দেব না বলে ফ্যাকড়া তোলার পাণ্ডা। কাজেই তাঁর থাকা না থাকা সময় বাক্যালাপ তো বন্ধ। সেজই যা একটু সহজ। তো তিনি বাড়িতে ক-দণ্ড থাকেন? নানান ধান্দায় সারাক্ষণই বাইরে বাইরে।···ঠাকুরের দয়ায় তিনি সেদিন তখন বাড়ি ছিলেন। তাই ওই জ্বর দেখিয়া বিচলিত হইয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন।

হ্যাঁ তখনও তো আমি ঠাকুর ঠাকুরের দয়া এই সব কথাগুলি মানিতাম।

অর্থাৎ মানিতে অভ্যস্ত ছিলাম।

তাই ভাবিয়াছিলাম ভাগ্যিস!

কারণ ডাক্তার আসিয়া পড়িয়াছিলেন তখনিই। বাড়ির চিরকেলে ডাক্তার। চেনা। তারপর?

তিনি রোগীকে আষ্টেপৃষ্ঠে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেছি তাই! সেই সর্বনেশে জ্বরই ধরিয়ে এসেছে।…বিলেত থেকে না জাপান থেকে না বর্মা থেকে এই এক জ্বর এসে হাজির হয়েছে কলকাতায়। লম্বা নাম। মুখস্ত রাখা দায়।—জ্বরে ধরবার দশ মিনিট আগেও রুগি টের পায় না। খপ করে ধরে। আর ধরা মাত্রই প্রবল কাঁপুনি, অজ্ঞান অচৈতন বেহুঁশ। আর তারপর যমে মানুষে টানাটানি। কে নেবে, কে রাখবে।…সে লড়াইয়ে জেতা ভাগ্যের ফল!

যমে মানুষে লড়াই?

কে করেছিল যেন একজন? খুব সাহসী পরম সতী একটি মেয়ে! পুরাণের কথা। তেমন মেয়ে কি জগৎ সংসারে মাত্র একবারই জন্মায়? আর পুরাণের সেই মেয়ের নামই চিরকাল থাকিয়া যাইবে? আর কখনও তেমন জন্মাইবে না? বিধাতা পুরুষ তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াই কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? আর ঘুমন্তই আছেন?

জ্ঞাতি পিস শাশুড়ি আসিয়া বলিলেন, স্বামীর নামে মা কালীর কাছে শাঁখা সিঁদুর বাঁধা দেওয়া মানত করো মা রাঙা বৌমা। মানত করো স্বামীকে ভাল করে দাও হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে গিয়ে শাঁখা সিঁদুর শাড়ি দিয়ে তোমার পুজো দিয়ে আসব।

কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাকাই। কথাগুলির মানে মাথায় ঢোকে না।

তিনি অবশ্য মাথায় ঢুকাইয়া দিলেন। বলিলেন, তোমার নিত্য ব্যবহারের সিঁদুর কৌটোটা আর হাতের শাঁখা জোড়াটা খুলে আমার হাতে দাও। আমি মা কালীর কাছে এক্ষুণি চলে যাই। আজ শনিবার আছে। মায়ের বার। যতদিন না নবুর জ্বর ছাড়ে, মায়ের চরণে জিম্মে থাকবে। জ্বর ছাড়লে বন্ধাকি জিনিস ছাড়িয়ে নিয়ে তবে সিঁদুর মাথায় দেবে।

শাঁখা জোড়াটা খুলিয়া ওর হাতে দিয়া দিব? দিয়া দিব—আমার সেই পরম আদরের পতি পরমগুরু লেখা রুপোর সিঁদুর কৌটোটি।

এ আবার কী রকম মানত?

শুনিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

যতদিন না জ্বর ছাড়ে।

মা কালী এক রাতের মধ্যে ছাড়াইয়া দিবার ভরসা দিবেন কি? এমন

আশ্বাস আছে তবে? আমি শাঁখা খোলা হাতে সিঁদুরবিহীন সিঁথি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব? স্বামীর সামনে যাইয়া সেবা করিব?

মাথার মধ্যে কী যেন করিয়া উঠিল। মনে হইল বুঝি আমার বিরুদ্ধে কোথাও ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবার মতলব।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া তীব্র চীৎকার করিয়া শাঁখা পরা হাত দুটা আঁচলের তলায় ঢাকা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, না! না! কখনও না। কিছুতেই না! শাঁখা সিঁদুর এই তো নারী জীবনের সর্বস্ব!

ও মা! এ আবার কী রণমূর্তি!

এইরকম কী যেন বলিয়া উঠিয়া পিস শাশুড়ি সমস্ত মহিলা মহলের কাছে গিয়া হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন।

পাগল নয় ছাগল নয়, আস্ত সুস্থ একটা মানুষ, গুরুজনকে এই অপমানটা করল! অ্যাঁ। বাবার জন্মে এমন মেয়েমানুষ দেখিনি গো!·· গলায় দড়ি আমার তাই ওনার ভাল করতে চেয়েছিলাম। সেই সকাল থেকে ওই বেলা দুপুর অবধি নির্জলা রয়েছি? বন্ধকি মালটি মায়ের চরণে পেঁছে দেবার জন্যে! তো বৌ যেন তেড়ে মারতে এল। এমন ভঙ্গি করল যেন আমি কেড়ে নিতে যাচ্ছি!···বলি তোমরা দেখলে তো? দশজনের সামনে, একটা সব্বজন পুজ্যি মানুষকে কী হ্যানোস্তাটা করল!···বলি অ বড় গিন্নি! এখনও তো চড়ি ওল্টাওনি। বিছানায় পড়ে পড়ে সবইতো জানছ বুঝছ! দেখলে কাণ্ডটা?···কোন নাস্তিকের ঘর থেকে মেয়ে এনেছিলে গো। ঠাকুর দেবতা মানে না?···সব করবে ডাক্তার! তাই লাজলজ্জা ভুলে ভাসুরের সমক্ষে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছে।···এ সংসারে এমন জাঁহাবাজ বৌ আর কখনও এসেছে? শুনলুম না কি ভাসুরের সামনে গায়ের গহনাগুলো খুলে ডাক্তারের সামনে ধরে দিয়ে বলেছে, ডাক্তারবাবু যেমন করে হোক ওঁকে বাঁচান! টাকার অভাবে যেন কোনও ত্রুটি না হয়। শুনলে এই বৌ নিয়ে তোমরা এতকাল ঘর করছ? আর ধন্যি ধন্যি দিয়েছ। বশীকরণ করে রেখেছেল নাকি সবাইকে? বৈঠকখানা ঘরে দেখলুম সেজ খোকা মরমে মরে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। বলে, এতখানি বয়েসে এত অপদস্ত হইনি পিসি। নবু শুধু ওনারই, আমার ভাই নয়? আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখতাম?···যাক এখন আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি হল। যাঁর জিনিস, তিনিই যখন দায়িত্ব নিতে হাল ধরলেন, তখন আর কারুর কোনও দায় নেই!

উঃ কী অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন উনি। বাড়িতে যে একটা অজ্ঞান অচেতন রুগি রয়েছে, সে হুঁশ নাই?···আমার আর মুখ দিয়া কথা বাহির

হইতেছে না !···কী বলিতে কী বলিয়া বসিব, কার কোথায় অপমান হইবে কে জানে !

আমি কি তাহা হইলে সেদিন ডাক্তারবাবুর সামনে খুব নির্লজ্জ ব্যবহার করিয়াছিলাম ? আর কেউ কখনও এমন করে না ?···উনি ভাল হইয়া উঠিয়া পরে এ কথা শুনিলে খুব বিরক্ত হইবেন ?···ওঃ। তা হোন। বিরক্তির বশে উনি যদি তখন আমার গালে ঠাস ঠাস করিয়া দশ ঘা চড় বসাইয়া দেন, তাও আমার পক্ষে আশীর্বাদ।

উনি সারিয়া উঠিয়া আমায় মারুন, কাটুন, ত্যাগ দিয়া তাড়াইয়া দিন, তাও সহিব। শুধু উনি একবার চোখ মেলিয়া তাকান।

পিসশাশুড়ি আরও কতক্ষণ কত কী বলিয়া শেষমেশ বলিলেন, ওই— নাস্তিক বৌ একবার যদি যেত আমার সঙ্গে, তো দেখত—কালীঘাটে গিয়ে। মায়ের চরণে, জোড়ায় জোড়ায় কত শাঁখা নোয়া বাঁধা দেওয়া রয়েছে। সিঁদুর কৌটোর পাহাড় মার পায়ের তলায়।···আর উনি মেম সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন পিসশাউড়ি বুড়ি ওনার অকল্যাণ অমঙ্গল করার মতলব ভাঁজতে এয়েছে !···আচ্ছা—ঠিক আছে, মা কালী বুঝবেন। তবে এটা বলে যাচ্ছি, পেটে বিদ্যে আছে বলেই বেশি অহঙ্কার ভাল নয়। বিদ্যে থাকলেই যে বুদ্ধি থাকে তা নয় গো বাছা। সে হুঁশ রেখো।···বুদ্ধি থাকলে গুরু লঘু জ্ঞানটা থাকে।···আমার স্বামী। আমি বাঁচিয়ে তুলব। বলি আর কারুর কেউ নয় ও ? বলি নবাকে আমরা জন্মাতে দেখেছি, না ওই বিদ্যেবতী বৌ দেখেছে ? ···যাক পুরাণের সাবিত্রীর মতন বাঁচা স্বামীকে, যমকে হঠিয়ে !···দেখবখন মরবো না তো। আমার তো মরণ নেই। শুনলাম তো সবই। কাউর হাতে ওষুদপথ্যি দিয়ে বিশ্বাস নেই। সব নিজের হাতে করব ! সেই নিয়ে কেবল ডাক্তারের সঙ্গে ফুসফুস গুজগুজ। আচ্ছা ! নবা ভাল হয়ে উঠলেই ভাল। তবে এ ভিটেয়, এই মহেশ্বরী বামনি আর নয়।

কথা ?

না অগ্নি স্রোত ? তা না হইলে অত কথার স্রোতের প্রতিটি কথা আগুনের ছাঁকার মতো মনে থাকে ? কিন্তু তবু সবই কি ?···ভাই মনের কথা ! বিশ্বাস করো ওই সব নয়। মাঝে মাঝে সংসারের আর পাঁচ মহিলার সায় আর সহানুভূতির বাণীতে নতুন করিয়া উথলাইয়া উথলাইয়া উঠিয়াছেন আর নতুন করিয়া ধরিয়াছেন।···

অবশেষে তিনি চলিয়া যাওয়ার পর হুঁশ হইল। স্বামীর ডাবের জল খাইবার সময় পার হইয়া গিয়াছে।

খাওয়া মাত্র তো ফোঁটা ফোঁটা করিয়া। জিভে দেওয়া। এখন শুরু

করিলে, ওষুধ খাওয়ার সময় চলিয়া যাইবে।

ঠাকুর! আমি কী করিব? কী করিব?

ছিঃ। এই শক্তি লইয়া, আমি নিজেকে সাবিত্রীর ভাব ছায়া বলিয়া আত্ম সন্তোষ লাভ করিতেছি? ভাবিতেছি যমে মানুষের লড়াইয়ে যমকেই পরাস্ত করিতে পারিব!

একি আমার অহঙ্কার?

ঠাকুর জানেন, অহঙ্কার না প্রাণের ব্যাকুলতা?

অথচ সকলেই বিচারে রায় দিতেছেন, আমার এই ব্যাকুলতার প্রকাশে নাকি গুরুজনেদের প্রতি অসম্মান দেখানো হইয়াছে।

আমার সেজ ভাসুর ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন নবু শুধু ওঁরই? আমার ভাই নয়?

কিন্তু ভাই কি বড় ভাসুর মেজ ভাসুর ন-ভাসুরেরও নয়? কই তাঁহারা তো এত বড় অসুখ শুনিয়াও ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন না! এপাড়া ওপাড়া বৈ তো নয়। একজন তো এই বাড়ির মধ্যেই একই ছাতের নীচেই বাস করিতেছেন। একটু সাড়াও দিয়াছেন?

মনে হয়, ন জা দাস দাসীদের মাধ্যমে খবর জানিবার চেষ্টা করেন। পুরনো লোকেরাও তো সবাই নাই।

যাহারা খাওয়া পরা করিয়া রাতদিন থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই একে একে বিদায় লইয়াছে। ঠিকের কাজে দুএকজন আছে।

এখন তো দেখি হরিপদর মার হরিপদ বছর আষ্টেকের ওই ছেলেটা বর্তমানে সংসারের প্রায় সব কাজই করে। আবার নিজের থেকেই মলিন মুখে রোগীর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কিছু দরকার কি না জিজ্ঞাসা করে।

তা দরকার হয় বৈকি। বরফের চাঁই বসানো থাকে দালানের একধারে, সেই চাঁই থেকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া আইসু ব্যাগে ভরিয়া দেয় হরিপদ।

তাও ভাঙিবার সময়, শব্দ বাঁচাইয়া সাবধানে ভাঙে।

জ্বর বাড়িলেই তো বরফ দিতে হয়।

আজই আর এক ঘটনা ঘটিল।

পিসিমা চলিয়া যাইবার একটু পরেই হঠাৎ বড়দি আসিয়া হাজির হইলেন, চোখ মুছিতে মুছিতে। অভিমানে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিলেন, নবুর এত অসুখ আর আমায় কেউ খবর দেয়নি?

ইদানীং কেবলই সংকল্প করিতেছিলাম। কোনও কিছুতেই আর আশ্চর্য

হইব না। তবুও আশ্চর্য হইলাম। কেউ খবর দেয় নাই?

কোথায়? লোক মুখে একটা উড়ো খবর পেয়েই এক ভাগ্নেকে সঙ্গে করে চলে এসেছি।

ঠিক সেই সময় বরফ দিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

বড়দি আসিয়া কপালে একটি হাত রাখিয়া বলিলেন, নবু! কষ্ট হচ্ছে রে।

মনে হইল উনি চোখটা একবার মেলিলেন। অস্ফুটে একটু আরামের আঃ বলিলেন যেন!

হাতে চাঁদ পাইলাম যেন।

তবে কি বড়দি থাকিলে, উনি শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবেন?

বড়দি তো ওঁর কাছে মায়ের মতো!

বলিয়াছিলাম সে কথা।

কিন্তু বড়দির এখন আর সংসার ফেলিয়া দুই দিনও নাকি থাকার জো নাই।

থাকিতে না পারার জন্য খুব হাহুতাশ করিয়া বলিলেন, ভাল হয়ে যাবে। ভাবনা করিস না রাঙা বৌ।

তারপরই বলিলেন, ওরা সবাই বলছিল, ও বাড়ির পিসি না কি তোকে কী মানত করতে বলেছিলেন, তুই রাজি হসনি।···কাজটা ভাল করিসনি ভাই। স্বামী পুত্তুরের বাড়াবাড়ি অসুখের সময়। সকলের সব উপদেশ মাথা পেতে নিতে হয়।···তাছাড়া—

গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, মহেশ্বরী পিসিটিতো লোক সুবিধের নয়। উনি ইচ্ছে করলে লোকের ভাল করতেও পারেন, আবার মেজাজ বিগড়োলে মন্দ করতেও পারেন।

মন্দ করতে পারেন। বুকের মধ্যে দমাস দমাস হাতুড়ির ঘা পড়ে! ··

আমি কি তবে ভুলই করিলাম? পিসিমা যা বলিয়াছিলেন, তাই করা উচিত ছিল? ওঁরা কত জানেন। হয়তো ভালই হইয়া যাইতেন। কিন্তু এখন যদি রাগিয়া গিয়া কিছু করেন?

তবু—ভাবিতেছি শাঁখা খুলিয়া সিঁদুর মুছিয়া ফেলার মানত শুনিয়া তখনই শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা যে না না করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে মানত করিব কী রূপে?

ঠিক আছে।

সাবিত্রীর মতো শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত লড়াই করিয়া চলিব। দেখি কতদিন কতক্ষণ সেই লড়াই করিবারও সময় পাই। তারপর যা করিবার করিব।

লড়াইয়ে সত্যকার জিতিতে না পারি, হারিয়াই জিতিব। যমরাজ দেখিবেন যাহাকে নিতে আসিয়াছেন, তাহার আগে আরও একজনকে নিয়া যাইতে হইবে তাঁহাকে!···ফেলিয়া যাইতে পারিবেন?

এই একটি জিনিস তো নিজের হাতেই আছে।···

বিষ বড়িও যদি না জোটে এই বৃহৎ সংসারে একটা শক্ত দড়িও জুটিবে না!···

বরফেও আর জ্বর নামিতেছে না।

না কি বিকার মাথায় উঠিয়াছে। ভুল বকিয়া চলিয়াছেন। সারারাত সারাদিন।···

ও কে? ঘরের মধ্যে ওরা কারা? কী বলছে ওরা ফিসফিস করে? ওদের মধ্যে ও কে?···বাবা! বাবা! আপনি? বাবা। কোথায় ছিলেন এতদিন?··· দেখুন আপনি বেড়াতে যাওয়ার ফাঁকে সবাই মিলে কী করে ফেলেছে আপনার বাড়িটাকে? ··বকছেন না কেন সব্বাইকে? বাবা! কথা বলছেন না কেন?··· চলে যাচ্ছেন? অ্যাঁ! দাঁড়ান! দাঁড়ান। আমি যাব আপনার সঙ্গেই!

মেজ কাকা মেজ খুড়ি অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়া ছিলেন। চুপিচুপি বলাবলি করিলেন। মৃত মানুষদের ঘরে ঘোরা ফেরা করতে দেখছে? তা হলে আর ভাষ্যি নেই।···ও। ডাক্তারও জবাব দিয়ে গেছে সকালে তবে তো হয়েই গেল!

কিন্তু আমার আর কিসের ভয়? সেই ভয়ঙ্কর ভয় নিবারণের ওষুধ তো আমার হাতের মুঠোয়।





॥ ৩৪ ॥

ঘরে ড্রেসিং টেবিল রয়েছে, তবু সকাল বেলা উঠেই ফুলকি আলমারির পাল্লায় বসানো লম্বা আর্শিটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেন পর্যবেক্ষণ করে কী দেখছে !···সুচেতা ঘরে ঢুকল।

সুচেতা তো কখন উঠেছে। ও একেবারে স্নান স্নিগ্ধ হয়েই এসেছে এ ঘরে।

এসেই বলে উঠল, কীরে ফুলকি গলায় কী হল ?

তাই তো ভাবছি। আহা মা, আমার গলায় এই লাইন লাইন দাগগুলো কিসের ?

ও মা ! দাগ আবার কী ? রাতে কোনও পোকা টোকা কামড়ায়নি তো ?

আঃ। পোকা কামড়াতে যাবে কেন মশারির মধ্যে। বলছি এই খাঁজ খাঁজ দাগগুলো।

এই দেখো। ও তো গলার গড়নের দাগ।

আমার জন্মানোর সময়ও ছিল !

ফুলকি একটু উত্তেজিত হয়। কই দেখি কী দাগ ? ওমা—সুচেতা হেসে ফেলে, ছিল না তো কি কেউ নরুন দিয়ে চিরে চিরে আঁক কেটেছে বসে

বসে ! ও তো গলার গড়ানের রেখা !

বললেই হল ? কই তোমার তো নেই ।

—আমার ? আমার অন্য গড়ন । তোর অনেক কিছু তোর বাবার মতো । এই রেখা রেখা গোলালো গলাকে কী বলে জানিস ? কম্বুকণ্ঠ । কম্বু মানে জানিস তো ? শাঁখ । শাঁখের গায়ে এইরকম স্বভাবগত রেখা থাকে । দেখিসনি ? তা শাঁখই বা হাতে করলি কবে ? আমার গলায় নেই কেন বলছিস ?

সুচেতা একটু কৃত্রিম গর্বিত ভঙ্গি করে বলে, আমার হচ্ছে গিয়ে যাকে বলে, মরাল গ্রীবা ! নো দাগ, নো রেখা । একদম পালিশ করা মসৃণ । বলে হেসে ওঠে, যাই বলিস গলার গড়ন নিয়ে আমার একটু অহঙ্কার করা চলে ।

করো যত ইচ্ছে অহঙ্কার ! আমি বলছি আমার জন্মানোর সময় দাগটা ঠিক কী রকম ছিল ? মোচড়ানো মতো ?

আঃ । ফুলকি, এ আবার কী কিম্ভূত প্রশ্ন তো ?···বললাম না । মানুষের শরীরের গড়ন নানারকম থাকেই । তার নামও থাকে সেই যে কবে যেন তোর ছবি আঁকার মাস্টারমশাই একখানা পাতলা চটি বই দেখাতে এনেছিলেন । নামটা বোধহয়—সৌন্দর্যের উপমা । তাতে কতরকম চোখ আঁকা ছিল—পটল চেরা পদ্ম পলাশ মীনাক্ষী কুরঙ্গ নয়ন—ওতেই দেখেছিলাম কাকে বলে মরাল গ্রীবা, কাকে বলে কম্বুকণ্ঠ, কাকে বলে—

মা ।

ফুলকি হতাশ ভাবে বসে পড়ে বলে, অত সব আলতু ফালতু কথা কে শুনতে চাইছে ?···আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, জন্মাবার সময় আমার গলাটা ঠিক কী রকম ছিল । এইরকম দাগ দাগ ? দেখে মনে হয়েছিল যেন দড়ি জড়ানোর মতো ?

নাঃ । সুচেতা ক্রমশঃ নিঃসংশয় হচ্ছে । মাথাটাই বিগড়ে গেছে মেয়েটার । তবু রাগ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, জন্মানোর সময় ঠিক কেমনটি ছিল, জানতে হলে, জিগ্যেস করগে যা, যে নার্সিংহোমে জন্মেছিলি, সেই নার্সিংহোমের ডাক্তার নার্স ধাইদের জিগ্যেস করগে যা ! মায়ের তখন জ্ঞান গম্যি থাকে ?

ফুলকির স্বভাবে ফুলকিরও তো পালটা চেঁচিয়ে ওঠার কথা । কিন্তু তা না করে সে কেমন যেন করুণ ভাবে বলে, সব কথায় অমন রেগে ওঠো কেন মা ? খুব একটা ভাবনায় পড়েছি বলেই জিজ্ঞেস করছি । আমি জানি তখন মায়ের জ্ঞান গম্যি থাকে না ? তা বলবে তো সেটা ?

ফুলকির মুখে এমন নম্র করুণ বচন !

তার মা প্রায় থতমত খেয়ে বলে, এ নিয়ে তোর কী এত ভাবনা তা তো

জানি না বাবা! · তবে সবাইয়েরই যে জ্ঞান গম্যি থাকে না তা নয়, আমারই ছিল না।···অনেকক্ষণ কষ্ট পেয়েছিলাম কিনা। জ্ঞান হতে শুনলাম বাচ্চা না কি জন্মেই যে ট্যাঁ করে কেঁদে ওঠে তা কাঁদেনি। তাঁকে কাঁদানোর চেষ্টা করানো হচ্ছে।

ফুলকি অবাক হয়ে বলে, কাঁদানোর চেষ্টা হচ্ছে?

তা হবে না? জন্মেই কান্নাই তো নিয়ম।

তাই বলছ? মা। আমি তাহলে নিয়ম ছাড়া হলাম কেন! কেন তা ডাক্তারেই জানে।

বলেই মা হেসে ফেলে বলে, পরে বলেছিল তেমন জোরালো ছিলি না না কী।···তারপর যা হল, ওরে বাবা! মেয়ের চিৎকারে বাড়ি তো বাড়ি পাড়াই ফাটে। আর এখন? মেজাজের জোরে তো মা থরহরিকম্প।

ফুলকি তবু অন্যমনা ভাবে বলে, কিন্তু মা। জন্মেই কেন কাঁদলাম না?

বললাম তো ডাক্তার ওই বলেছিল, বুকের জোর কম।

ফুলকি আস্তে বলে, তা হতেই পারে।

বিড়বিড় করে আবার কী বলছিসরে ফুলকি?

না এমনি। ভাবছি সবই প্রায় মিলেই যাচ্ছে!

তোর কথার মাথামুণ্ডু বোঝবার ক্ষমতা নেই আমার বাবা। বলি চানটান করতে যাবি না কী? কলেজ নেই? ছুটি?

কলেজ! ও! হ্যাঁ তো। বাঃ, কলেজ নেই মানে? তুমি এমন এক একটা অ্যাবসার্ড কথা বলো। শুধু শুধু ছুটি থাকবে কেন?

কলেজ থেকে ফেরার মুখে বাবার মুখোমুখি! বাবা কোথাও বেরোচ্ছে।

দেখা মাত্রই বলে ওঠে কিশলয়, ওরে ফুলকি! এসে গেছিস ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়িনি। সেই থেকে ভাবছি এত দেরি হচ্ছে কেন।···ওরে সকালে গিয়েছিলাম তোর সেই বিনোদের বাড়ি।

আমার বিনোদ হোয়াই?

আরে বাবা, সেই কাঠের মিস্ত্রিটা রে?···তো যাওয়াই সার! লাভ হল না কিচ্ছু। ব্যাটা ইতিমধ্যেই সেই বিরাট ক্যাবিনেট খানাকে খুলে ফেলে, সাইজ করে করে কেটে ফেলে গুছিয়ে রেখেছে। তো বলল বটে, ভেতরে আলাদা একটা চেম্বার ছিল—

ছিল!

ফুলকির মুখটা যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তেজিতও।

ছিল! তো বলল, সেখানে এ রকম ধাঁচেরই ফ্যাশান ছিল। আকছারই এমন থাকত। কিন্তু বাবু তার মধ্যে খাতাফাতা ছিল না!

ফুলকি একটু তাকিয়ে বলে, ও ঠিক ঠিক সত্যি বলছে, তোমার বিশ্বাস?

বাঃ। না বলবে কেন? সামান্য একখানা খাতা বৈ তো নয় গাপ করে ফেলে কী করবে?…বরং পাওয়া গেলে বখশিস পাবার আশা ছিল। বলেছিলাম তাই।

ফুলকি উদাস ভাবে বলে তুমি অবশ্য জিনিসটা সামান্যই বলবে বাপি, সবাই কি সব জিনিসের মূল্য বোঝে? যাকগে ও নিয়ে আর ভাবার কী আছে? পাওয়া গেল আর না গেল, একই কথা। আর কী হবে? সবই তো শেষ হয়ে গেছে।

বলেই হঠাৎ কেমন ব্যগ্রভাবে বলে ওঠে। বাপি! সেই বাড়িটাকে আমায় একবার দেখাতে নিয়ে যাবে? শুধু একবার দেখব।

কোন বাড়ি রে?

বাঃ ওই যে মনোহরপুরের মুখুয্যে বাড়ি না কী।

মনোহরপুর নয় রে বাবা, মনোহরপুকুর। তো-সেই বাড়ি তুই এখন দেখতে চাইছিস? হা হা হা!··সেখানে—তার আর কোনও চিহ্ন মাত্র আছে নাকি? ছ-তলা বিল্ডিঙের স্ট্রাকচার গাঁথা হয়ে গেছে! ভাঙা আস্ত ইটগুলো পর্যন্ত সুরকিকলে চালান হয়ে গেছে। পাতলা পাতলা একটু ছোট সাইজের সেই সেকালের ইটগুলো দেখতে কিন্তু ভারি—মজার মিষ্টি মতো দেখতে ছিল! ভাগ্যিস তুই দেখিসনি।…তুই যা মেয়ে! দেখলেই হয়তো বলে বসতিস আমি চারটি তুলে রাখি!…হা হা হা!

বাপি! তুমি হাসছ? হাসবে না বলছি! শুনে আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

———

আমাদের প্রকাশিত
লেখিকার দুটি উপন্যাস অমনিবাস

উপন্যাস এবং উপন্যাস

[রঙের তাস, রাণীশহরের কানাগলি,
জালিকাটা রোদ, দুই শিবির,
যুগে যুগে প্রেম, নয় ছয়]

আবার ফিরে দেখা

[নেপথ্য নায়িকা, উড়োপাখি,
পলাতক সৈনিক, সোনার হরিণ, নীলপর্দা]